ছোটদের
নবী-রসূল
[১]
অধ্যাপক মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক

ছোটদের নবী-রসূল-১

রচনায়

অধ্যাপক মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
এম. এম, বি. এ. (অনার্স), এম.এ.
সিনিয়র রিসার্চ স্কলার
ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি

ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি

ছোটদের নবী-রসূল

প্রকাশনায় ঃ
ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি
৭৩, আউটার সার্কুলার রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ৯৩৩০২০২, ৮৩১৮৬১১
Website : www,ies.com
E-mal : ies@iesbd.com

প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর-১৯৮৪

২০তম সংস্করণ ঃ

ফেব্রয়ারী	ঃ	২০১০ ঈসায়ী
ফালগুন	ঃ	১৪১৬ বাংলা
রবিউল আউয়াল	ঃ	১৪৩১ হিজরী

মূল্য ঃ ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টাকা মাত্র।

কম্পিউটার কম্পোজঃ
ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি
কম্পিউটার সেন্টার

CHHOTADER NABIRASUL By Prof. Mohammad Mozammel Hoque,
Published by Islamic Education Society.

লেখকের কথা

একটি শিশু যখন ভূমিষ্ট হয় তখন সে থাকে নিষ্কলুষ ও পবিত্র। এ পৃথিবী সম্পর্কে তখন তার কোন ধারণা থাকে না। ক্রমে সে বড় হতে থাকে এবং প্রথমে আশেপাশের ও পরে বৃহত্তর পরিবেশ থেকে জ্ঞান লাভ করতে থাকে। পরিবেশ যদি ভাল হয় তাহলে শিশুর মন-মানসের ওপর তার ভাল প্রভাব পড়ে এবং সেভাবেই সে গড়ে ওঠে। কিন্তু পরিবেশ খারাপ হলে শিশুও তা থেকে খারাপভাবে প্রভাবান্বিত হয়।

আমরা আমাদের দেশের বর্তমান পারিপার্শ্বিক ও অন্যান্য পরিবেশকে মোটেই ভাল বলতে পারি না। তাই শিশুদের মধ্যে সুষ্ঠু মননশীলতা, উন্নত নৈতিক বোধ এবং উদার ও মানবিক চরিত্র গড়ে তোলার জন্য কিছু উন্নত ও মহান চরিত্রের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া একান্ত প্রয়োজন। বলা বাহুল্য নবী-রসূলদের চরিত্র ছাড়া এরূপ চরিত্র আর কিছুই হতে পারে না। তাই সব রকম মাদরাসা ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ছোটদের নবী-রসুল নামের এ বই লেখার প্রয়াস। এ বইয়ের মাধ্যমে আমাদের দেশের শিশুদের চরিত্র গঠনে সহায়তা হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আর তাহলে আমার এ শ্রম সার্থক হবে।

বইখানাতে তথ্যগত কোন ভুল থাকলে তা আমার ব্যক্তিগত দুর্বলতা। কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে তা দেখিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি বইখানির ১৯তম বর্ধিত সংস্করণও প্রকাশ করছে বলে আমি সোসাইটির কাছে কৃতজ্ঞ।

বিনীত
লেখক
তারিখ- জানুয়ারী ২০০৮

সূচীপত্র

হযরত আদম আলাইহিস সালাম

তোমরা জান মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি শুধু আমাদেরকেই সৃষ্টি করেননি সারা বিশ্ব-জাহানে যা কিছু আছে তা সবই তাঁর সৃষ্টি। তিনি গাছ-পালা, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, আসমান-জমিন সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। এ সব সৃষ্টি করতে তাঁর মোটেই কোন কষ্ট হয়নি। তিনি এমন ক্ষমতার অধিকারী যে কোন কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলে শুধু আদেশ করেন "হয়ে যাও" আর সংগে সংগে ঐ বস্তুটি হয়ে যায়। যে বিশাল পৃথিবীতে আমরা বাস করছি তাও তিনি এভাবেই সৃষ্টি করেছেন।

আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি আজ থেকে শত শত কোটি বছর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা সেটি সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবী সৃষ্টি করার পেছনে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য ছিল এখানে মানুষকে আবাদ করা। তাই বলে কিন্তু তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করার পর পরই এখানে মানুষকে পাঠাননি বরং মানুষকে এই পৃথিবীতে পাঠালে তার জীবন ধারণ করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন হবে সর্ব প্রথম এখানে সে সব জিনিস সৃষ্টি করেছেন। তাই সৃষ্টি করেছেন গাছ-পালা, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বন-উপবন, সাগর-মহাসাগর নানা রকমের জীব-জন্তু, পশু-পাখী এবং বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সব জিনিস। এসবও কিন্তু আবার একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এ জন্যও লেগেছে কোটি কোটি বছর।

মানুষ সৃষ্টিঃ

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের লক্ষ কোটি সৃষ্টি এ পৃথিবীতে আছে। এ সবের মধ্যে মানুষ সবার সেরা। মানুষের দেহের গঠন যেমন অনুপম তেমনি তার জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক-বিবেচনা, চিন্তা-চেতনা এবং সৌন্দর্য ও রুচিবোধও অতুলনীয়। এছাড়াও তারা আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয়তম সৃষ্টি। আর কোন সৃষ্টিই তার সমকক্ষ নয়। পৃথিবীর সব কিছু তাই মানুষের প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে।

সব কিছু সৃষ্টি করার পর মহান আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলেন মানুষ সৃষ্টি করার। একদিন ফেরেশতাদের ডেকে তিনি তাঁর এ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, "হে ফেরেশতারা, আমি পৃথিবীতে মানুষ নামে এক নতুন মাখলুক সৃষ্টি করতে চাচ্ছি। তারা হবে আমার খলীফা বা প্রতিনিধি। আমি যে ভাবে চাই আমার পক্ষ থেকে তারা সেভাবে দুনিয়াটা চালাবে।" ফেরেশতারা আল্লাহর এ উদ্দেশ্য বুঝতে পারলো না। তারা বললোঃ হে আল্লাহ, তোমার গুণগান ও প্রশংসা করার জন্য তো আমরাই আছি। রাত দিন সব সময় তোমার পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছি। তোমার হুকুম তা'মীল করছি। এ সবের জন্য তো আর কোন মাখলুকের প্রয়োজন নেই। তাছাড়া তোমার উদ্দেশ্য থেকে আমরা বুঝতে পারছি, এ নুতন সৃষ্টিকে তুমি অসংখ্য ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান করবে। তাদের থাকবে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি। যে কোন ব্যাপারে তারা তাদের ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে। এরূপ স্বাধীনতা ও কর্মক্ষমতা কোন সৃষ্টিকে

দেয়া হলে আমাদের ধারণায় তারা স্বেচ্ছাচারিতা চালাবে। পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ও খুনখারাবির মাধ্যমে এর পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলবে। অতএব এধরনের নতুন মাখলুক সৃষ্টির কি কোন প্রয়োজন আছে? জবাবে আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ হে ফেরেশতারা, আমি যা জানি তোমরা তা জান না।

এরপর আল্লাহ তা'আলা মাটি দিয়ে হযরত আদম আলাইহিস সালামের দেহ সৃষ্টি করলেন এবং পরে সেই দেহে প্রাণ দান করলেন। এভাবে হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হলো। তিনি হলেন দুনিয়ার সর্বপ্রথম মানুষ।

আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রয়োজনীয় সব রকমের জ্ঞান দান করলেন। অতি যত্নে সব কিছু তাঁকে শিখিয়ে দেয়া হলো। কারণ আল্লাহর এই বিশাল পৃথিবীতে তাকে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে হবে। এ দায়িত্ব পালন করতে হলে থাকতে হবে প্রয়োজনীয় ব্যাপক জ্ঞান। সকল জ্ঞানের উৎস হলেন মহান আল্লাহ। তাই তিনি নিজেই আদম (আ)কে এ জ্ঞান শিক্ষা দিলেন। পরে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের ডেকে ঐ সব বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু ফেরেশতারা সে সব বিষয়ে কিছুই বলতে পারলো না। তাঁরা বললোঃ হে আল্লাহ, সব জ্ঞানের মালিক তো তুমি। তুমি যাকে যতটুকু জ্ঞান দান করো সে ততটুকুই জানতে পারে। সুতরাং তুমি আমাদের যতটুকু জ্ঞান দান করেছো তার বেশী আমরা কিছুই জানি না। ফেরেশতাদের এই জবাব শুনে আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে তাদের সামনে হাজির করলেন এবং ঐসব বিষয়ে বলতে আদেশ দিলেন। আদম (আ) একের পর এক সব প্রশ্নের সঠিক জবাব দিলেন। এবার ফেরেশতারা বুঝতে পারলো যে সিদ্ধান্ত ক্রমেই বিভিন্ন বিষয়ে আদম (আ)-কে তাদের চেয়ে বেশী জ্ঞান দান করা হয়েছে। তারা এ কথাও বুঝতে পারলো যে, একটি বড় রকমের উদ্দেশ্য নিয়েই আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আদম (আ)-কে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের আদেশ করলেন। সব ফেরেশতাই তৎক্ষনাৎ আল্লাহর হুকুম তা'মীল করে হযরত আদম (আ)-কে সিজদা করলো। কিন্তু আযাযীল তাঁকে সিজদা করতে অস্বীকার করলো।

আযাযীল কে?

মানুষ সৃষ্টির আগে আল্লাহ তা'আলা জিন জাতিকে সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে বসবাসের জন্য দিয়েছিলেন। কিন্তু কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতা পাওয়ার পর তারা পৃথিবীতে মারামারি খুনখারাবি ও ফিতনা-ফাসাদ করে এর পরিবেশ বিষাক্ত ও কলুষিত করে তোলে। এ অবস্থা চরম পর্যায়ে পৌঁছলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কর্তৃত্ব থেকে বঞ্চিত করার সিদ্ধান্ত নেন এবং এ উদ্দেশ্যে একদল ফেরেশতা প্রেরণ করেন। ফেরেশতারা তাদের অনেককে হত্যা করেন এবং অনেককে বনবাদাড়, মরুভূমি, পাহাড়-পর্বত ও বিজন এলাকায় ভাগিয়ে দেন। এ কর্মকান্ডের এক পর্যায়ে তারা একটি সুন্দর জিন শিশুর সামনাসামনি হন। তার নাম আযাযীল। শিশুটির চেহারা গতিবিধি

তাদের বেশ আকৃষ্ট করে। তারা তাদের সাথে শিশুটিকে রাখার অনুমতি চেয়ে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করে জিন-শিশুটিকে তাদের সাথে রাখার অনুমতি দিলেন। ফেরেশতাদের সাথে থেকে সে আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা দেখায়। কিন্তু আদম (আ)-কে সিজদা করার ক্ষেত্রে সে চরম ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। এভাবে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে সে আদম (আ)-কে সিজদা করা থেকে বিরত থাকে আল্লাহর নাফরমানী করে বসলো।

তাই আল্লাহ তা'আলার কাছে সে লা'নতের যোগ্য হয়ে গেল। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি আদমকে সিজদা করলে না কেন? সে জবাব দিল হে আল্লাহ তুমি আগুন থেকে আমাকে সৃষ্টি করেছো। আর আদমকে সৃষ্টি করেছো মাটি থেকে। তাই আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। একারণে আমি তাকে সিজদা করতে পারি না। তার এ জবাবে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। কারণ একমাত্র আল্লাহই শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান। তাঁর হুকুম কেউ অমান্য করতে পারে না। তিনি আযাযীলকে ইবলিস ও শয়তান নামে আখ্যায়িত করে লা'নত দিয়ে তার দরবার থেকে বিতাড়িত করে দিলেন। তাকে জানিয়ে দিলেন ভয়ংকর শাস্তির স্থান জাহান্নাম তার জন্য অবধারিত। সেখানে তাকে কল্পনাতীত শাস্তি অনন্তকাল ধরে ভোগ করতে হবে। আমার এ সিদ্ধান্তের কোন ব্যতিক্রম হবে না। আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত হয়ে শয়তান চরমভাবে হতাশ হয়ে গেল। এবার সে চিন্তা করে দেখলো আদমের কারণেই সে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হলো। সুতরাং যে করেই হোক আদম এবং তার বংশধরদের ক্ষতি করতে হবে। সে অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহর কাছে কিয়ামত পর্যন্ত সময় প্রার্থনা করলো। সে বললো: হে আল্লাহ তুমি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দাও। আল্লাহ বললেন, তোমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দেয়া হলো। আল্লাহর পক্ষ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ লাভের ঘোষণা শুনে সে বললো: আমি কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকার যে সুযোগ পেলাম তা পুরোপুরি কাজে লাগাবো। আমি তোমার সকল বান্দাকে পথভ্রষ্ট করবো। তাদেরকে গোমরাহ করার কোন সুযোগই আমি ছাড়বো না। আল্লাহ তা'আলাও শয়তানকে বললেন: যারা সত্য সত্যই আমার আদেশ নিষেধ মেনে চলবে তাদেরকে তুমি গোমরাহ করতে পারবে না।

আল্লাহ তা'আলা এরপর আদম (আ)-কে বেহেশতের মধ্যে রেখে দিলেন। কিছুদিন পর হযরত হাওয়া আলাইহাস সালামকে সৃষ্টি করে আদম (আ)-এর স্ত্রী হিসেবে বেহেশতে রেখে দিলেন। আল্লাহ আদম ও হাওয়া (আ) উভয়কে বললেন, তোমরা যেভাবে ইচ্ছা বেহেশতে বসবাস করো। তবে একটি গাছ দেখিয়ে বললেন: এ গাছটির কাছে যেওনা। আমার এ আদেশ না মেনে এ গাছের কাছে গেলে তোমরা আমার হুকুম অমান্যকারী জালেম বলে গণ্য হবে। আদম ও হাওয়া আল্লাহর হুকুম মেনে নিলেন এবং মহাসুখে জান্নাতে বাস করতে থাকলেন।

এ দিকে শয়তান আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর থেকেই আদম ও হাওয়ার (আ) ক্ষতি সাধন করার সুযোগ খুঁজতে লাগলো। সে চেষ্টা চালাতে থাকলো তাদের আস্থা ও সান্নিধ্য

লাভের। অবশেষে একদিন সে তাঁদের সুপরামর্শ দাতা হিসেবে আস্থা লাভ করতে সক্ষম হলো। আদম ও হাওয়া (আ) কিন্তু শয়তানের মনোভাব মোটেও বুঝতে পারলেন না। এ সুযোগে শয়তান তাঁদেরকে বললো: আমি তোমাদের কল্যাণ কামনা করি। তোমাদের যে গাছের নিকট যেতে নিষেধ করা হয়েছে সে গাছের ফল খেলে তোমরা কখনোই মৃত্যুবরণ করবে না এবং এ বেহেশতেই চিরদিন থাকতে পারবে। শয়তানের এ ধোঁকায় পড়ে তাঁরা আল্লাহর নিষেধ ভুলে গেলেন এবং ঐ গাছের ফল খেলেন।

ফল খাওয়ার সাথে সাথে হযরত আদম ও হযরত হাওয়ার (আ) শরীর থেকে বেহেশতের পোশাক খসে পড়লো। তাদের লজ্জাস্থানসমূহ উন্মুক্ত হয়ে পড়লো। তারা গাছের পাতা ছিঁড়ে শরীর ঢাকতে শুরু করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ডেকে বললেন, তোমরা আমার হুকুম অমান্য করেছো। আমি তোমাদেরকে যা বলেছিলাম তা তোমরা মেনে চলেনি। একথা বুঝার সাথে সাথে আদম ও হাওয়া (আ) আল্লাহর কাছে ভুলের জন্য মাফ চাইলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের দো'আ কবুল করলেন এবং তাঁদেরকে মাফ করে দিলেন। আল্লাহ তা'আলা আদম ও হাওয়া (আ)-কে ডেকে বললেনঃ তোমরা দুনিয়াতে চলে যাও। পৃথিবী তোমাদের অবস্থান স্থল। মনে রেখো, শয়তান তোমাদের চিরশত্রু। সে বেহেশতে যেভাবে তোমাদের ধোঁকা দিয়ে আমার আদেশ অমান্য করালো দুনিয়াতেও তাই করার চেষ্টা করবে। পৃথিবীতে তোমরা কিভাবে জীবন যাপন করবে তা জানিয়ে তোমাদের কাছে আমার হুকুম পাঠানো হবে। আমার হুকুম মত চললে শয়তান তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

এরপর হযরত আদম ও হযরত হাওয়া (আ)-কে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হলো। দুনিয়ায় পাঠানোর সময় হযরত আদম ও হাওয়াকে (আ) একই জায়গায় না পাঠিয়ে দু'জনকে দু' জায়গায় পাঠানো হলো। দীর্ঘদিন পরে আরবের আরাফাত নামক স্থানে তাঁরা উভয়ে পরস্পরের সাক্ষাত লাভ করেন। দীর্ঘ দিন পর তারা একে অপরের সাক্ষাত পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং একত্রে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। এভাবে শুরু হলো এ পৃথিবীতে মানুষের পদচারণা এবং সভ্যতার ঊষাকাল।

সৃষ্টির পর আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)কে যে সব বিষয়ে জ্ঞান দান করেন তা ছিল মূলতঃ বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান। এক কথায় যাকে আমরা বস্তুবিজ্ঞান বলতে পারি। এ জ্ঞানের ভিত্তিতেই হযরত আদম এবং হযরত হাওয়া (আ) দুনিয়ায় জীবন যাপন শুরু করলেন। হযরত আদম (আ) ছিলেন এ পৃথিবীতে প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী। হযরত হাওয়া (আ)-এর গর্ভে হযরত আদমের (আ) বিশ বারে বিশ জোড়া অর্থাৎ মোট চল্লিশ জন ছেলে মেয়ে জন্মলাভ করলো। প্রত্যেকবারে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করতো। তাঁদের গর্ভের সন্তান-সন্ততি দ্বারা পরবর্তীকালে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

হযরত আদম (আ) ছিলেন পৃথিবীতে প্রথম নবী। তাঁর কাছে আল্লাহর অহী আসতো। অহী হচ্ছে আল্লাহর বাণী বা আল্লাহর হুকুম। ফেরেশতা আল্লাহর হুকুম বহন করে এনে হযরত আদম

(আ)-এর কাছে পৌঁছে দিয়ে যেতেন। অথবা কখনো আল্লাহ সরাসরি হযরত আদম (আ)-এর মনের মধ্যে তাঁর অহী পৌঁছে দিতেন। তিনি এই অহীর নির্দেশ মত নিজের জীবন যাপন করতেন। স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদেরকেও সেভাবে জীবন যাপন করতে আদেশ করতেন। তাঁর ছেলেমেয়ে ও নাতী-নাতনীরা যাতে আল্লাহকে ভুলে না যায় এবং সবাই আল্লাহর হুকুম মত চলে তিনি সেদিকে খেয়াল রাখতেন। তাদেরকে আল্লাহর হুকুম বুঝাতেন এবং তিনি সে অনুযায়ী জীবন যাপন করতে সাহায্য করতেন।

কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায় হযরত আদম আলাইহিস সালাম নয়শত ষাট বছর পৃথিবীতে বেঁচে ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে তার অধঃস্তন সন্তান-সন্ততিদের সংখ্যা বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

অনুশীলনী

১। সারা বিশ্ব-জাহানে যা কিছু আছে তা কে সৃষ্টি করেছেন?

২। আল্লাহ কত বছর পূর্বে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? তিনি কিভাবে সৃষ্টি করেন?

৩। আল্লাহ ফেরেশতাদের ডেকে কি বললেন?

৪। সর্ব প্রথম মানুষ কে?

৫। আল্লাহ ফেরেশতাদের কি আদেশ করলেন?

৬। কে আল্লাহর আদেশ মানলো না?

৭। আযাযীল কি বললো? সে বিতাড়িত হলো কেন?

৮। কিয়ামত পর্যন্ত আয়ু লাভ করার পর শয়তান কি ঘোষণা করলো?

৯। বেহেশতের মধ্যে আদম ও হাওয়া (আ) আল্লাহর নাফরমানী করলেন কেন?

১০। দুনিয়ায় আসার সময় আল্লাহ আদম ও হাওয়া (আ)-কে কি বললেন?

১১। আদম ও হাওয়া (আ) এর মোট কত জন ছেলে মেয়ে ছিল?

১২। অহী কি? অহী কিভাবে হযরত আদমের (আ) কাছে আসতো?

১৩। আজকের পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে যদি ভাই ভাই বলা হয় তাহলে কি ভুল হবে? কেন?

হযরত ইদরীস আলাইহিস সালাম

হযরত ইদরীস (আ) ছিলেন মহান আল্লাহর একজন নবী। তিনি ছিলেন পৃথিবীতে তৃতীয় নবী। অর্থাৎ হযরত আদম ও হযরত শীসের (আ) পরে তিনি নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। বাইবেলে তাঁর নাম হানুক বলা হয়েছে। কিন্তু কোরআনে তাঁর নাম বলা হয়েছে ইদরীস।

হযরত ইদরীস (আ) বর্তমান ইরাকের বাবেল (ব্যাবিলন) নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত আদমের (আ) পুত্র হযরত শীসের (আ) কাছে শিক্ষা লাভ করেন। এরপর বয়োপ্রাপ্ত হলে মহান আল্লাহ তাঁকে নবুওয়াত দান করেন। তাঁর সম্পর্কে কথিত আছে যে, নবুওয়াত লাভের পূর্বে তিনি মানব সমাজ থেকে দূরে দূরে থাকতেন। আর একা একা আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করে কাটাতেন। কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহকে ভুলে তাঁর দেখানো পথে চলা ছেড়ে দিল তখন আল্লাহ তাঁকে নবুওয়াত দান করলেন। অহীর দ্বারা আল্লাহ তাঁকে আদেশ করলেন: "হে ইদরীস, ওঠো। নির্জন ও নিরিবিলি জীবন ছেড়ে দাও। মানুষের মধ্যে ঘুরে ঘুরে তাদের কাছে আমার বাণী প্রচার কর। তাদেরকে বলো, তারা যেন অন্যায় ও অসত্যের পথ ছেড়ে আমার সত্য পথ গ্রহণ করে।"

আল্লাহর এই নির্দেশ পেয়ে হযরত ইদরীস (আ) পথভ্রষ্ট লোকদেরকে আল্লাহর পথে ডাকতে শুরু করলেন। তিনি পূর্ববর্তী নবী হযরত আদম ও হযরত শীসের (আ) শরীয়ত মেনে চলার জন্য লোকদের আদেশ করলেন। কিন্তু কিছু লোক ছাড়া কেউ-ই তাঁর কথা মানলো না। এ অবস্থা দেখে তিনি দেশ ছেড়ে হিজরত করতে মনস্থ করলেন। তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকেও হিজরত করতে বললেন। দাজলা ও ফোরাতের মত দু' দু'টি নদীর তীরে অবস্থিত ছিল এই বাবেল শহর। বড়ই সুখে সেখানে তাদের দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। এ দেশ ও শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা তারা কোন দিন কল্পনাও করতে পারতো না। তাই হযরত ইদরীস কর্তৃক হিজরতের নির্দেশ পালন করা তাদের জন্য খুব কঠিন বলে মনে হলো। তারা বললো: ঠিক আছে আমরা যাবো, কিন্তু এই বাবেলের মত এত সুন্দর শহর আমরা কোথায় পাবো? হযরত ইদরীস (আ) তাদের বললেনঃ তোমরা যদি আল্লাহর পথে এতটুকু কষ্ট সহ্য করো তাহলে তিনি তোমাদের অবশ্যই বাবেলের মত সুন্দর জায়গা দিতে পারেন। একথা শুনে সবাই হিজরত করতে রাজি হয়ে গেলো। হযরত ইদরীস (আ) তাদের নিয়ে মিসরে হিজরত করলেন। আর এভাবে দুনিয়ার বুকে আল্লাহর দীনের খাতিরে প্রিয় জন্মভূমি, পরিচিত পরিবেশ, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব সবাইকে ছেড়ে হিজরত করার সর্ব প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপিত হলো।

হযরত ইদরীস (আ) তার ঈমানদার সাথীদের নিয়ে মিসরে গিয়ে পৌঁছলেন। সংগীরা নীল নদের প্রবাহ এবং এর উভয় তীরের সুন্দর দৃশ্য ও উর্বর মাঠ ঘাট প্রান্তর দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলো। তিনি তাদেরকে বললেন: তোমাদের বাবেলের মত একটি মনোরম ও উর্বর জায়গা মনোনীত

করে বসতি গড়ে তোল। তারা নীল নদের তীরে একটি সুন্দর জায়গায় বসতি স্থাপন করলো। এ জায়গাও ছিল বাবেলের মত সুন্দর। এত সুন্দর জায়গা পেয়ে তারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলো।

হযরত ইদরীস (আ) এখানে এসে আবার মানুষকে আল্লাহর দীনের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। তিনি সুন্দর আচার-আচরণ ও মধুর ব্যবহার দ্বারা মানুষকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হলেন। তিনি সবাইকে ডেকে বললেনঃ তোমরা সবাই একমাত্র আল্লাহর ইবাদত ও দাসত্ব করো। তিনি তাদের নামায পড়তে, রোযা রাখতে, যাকাত দিতে এবং পাক-পবিত্র থাকতে বললেন। তিনি মানুষকে বুঝালেন যে, আখেরাতের আযাব থেকে বাঁচতে হলে দুনিয়াতে সৎ কাজ করতে হবে। এসব কথা প্রচার করার জন্য তিনি বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াতেন। যেখানেই যেতেন সেখানেই মানুষকে জড়ো করে এ সব কথা বলতেন। রাত দিন অনেক পরিশ্রম ও কষ্ট করে তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত এ কাজ করতে থাকলেন। তিনি বিভিন্ন এলাকার মানুষের মধ্যে ঘুরে ঘুরে তাদেরকে উন্নত জীবনযাত্রা এবং সভ্য জীবন যাপনের বিভিন্ন নিয়ম কানুন বুঝাতে থাকলেন। তিনি বিভিন্ন গোত্র-উপগোত্র থেকে শিক্ষার্থী সংগ্রহ করে তাদের এসব নিয়ম শিক্ষা দিলেন। শিক্ষা শেষে যারা নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে উন্নত জনপদ গড়ে তুললো। তিনি তার ছাত্রদেরকে আরো অনেক জ্ঞানের বিষয়ও শিক্ষা দিয়েছেন যার মধ্যে বিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানও ছিলো। তাঁর এই কঠোর সাধনার ফল হলো এই যে, সব লোক তাঁর কথা মেনে নিল। তিনি হলেন এসব লোকের শাসক।

দীর্ঘ তিনশ' তিপ্পান্ন বছর পর্যন্ত তিনি ন্যায় ও ইনসাফের সাথে তাদেরকে শাসন করলেন। তাঁর শাসন যুগ ছিল খুবই শান্তিময়। তাঁর রাষ্ট্রে জনগণ পরম সুখে-শান্তিতে বসবাস করতো। সেখানে বর্ষিত হতো মহান আল্লাহর রহমত। তাই তাঁর রাষ্ট্রে মানুষের কোন রকম অভাব ছিল না। তাঁর সু-শাসনে জনগণ ছিল খুশী। তারা তাঁকে খুব সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখতো। কোরআন মজীদেও এ কথার উল্লেখ করে আল্লাহ বলেছেন: আমি তাঁকে অতি উচ্চ মর্যাদা দান করেছিলাম।

হযরত ইদরীসের (আ) কীর্তিসমূহ

জানা যায় ইদরীস (আ)-ই সর্ব প্রথম লেখার পদ্ধতি প্রচলন করেন। তাঁর আমলেই সর্ব প্রথম নগর সভ্যতা গড়ে ওঠে। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে রেখে বেশ কিছু সংখ্যক লোককে সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলেন। তারাই বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে এক একটি শহর নির্মাণ করেন। এভাবে তিনি বেঁচে থাকতেই একশ আটাশিটি শহর বা সভ্য জনপদ গড়ে উঠেছিল। তিনিই সর্ব প্রথম সংখ্যা গণনা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তিনি গ্রহ-উপগ্রহের চলাফেরা বা গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য বহু সংখ্যক মান-মন্দির নির্মাণ করেছিলেন বলেও জানা যায়। হযরত ইদরীসের (আ) আরো বহু কীর্তি রয়েছে যা তোমরা বড় হয়ে জানতে পারবে।

হযরত ইদরীসের (আ) শিক্ষার সার কথা

প্রত্যেক নবীই দুনিয়ায় একমাত্র আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম করার জন্য প্রেরিত হন। তাই যা সত্য ও ন্যায় তাই প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা আজীবন সাধনা করেন। হযরত ইদরীস (আ)-ও সারা জীবন মানুষকে আল্লাহর পথে ডেকেছেন এবং ভাল শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে যে সব শিক্ষা দিতেন তা হলোঃ

- আল্লাহ আছেন এ কথা বিশ্বাস করতে হবে।
- তিনি একা ও লা-শরীক এ কথা বিশ্বাস করতে হবে।
- একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে হবে।
- আখেরাতের আযাব থেকে বাঁচতে হলে দুনিয়ায় সৎ কাজ করতে হবে।
- দুনিয়ার প্রতি মোহ বর্জন করতে হবে।
- সব কাজ কর্মে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার করতে হবে।
- নির্দিষ্ট নিয়মে আল্লাহর ইবাদত করতে হবে।
- ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে সর্বদা জিহাদ করতে হবে।
- পাক-পবিত্র ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।
- কুকুর ও শূকর থেকে দূরে থাকতে হবে এবং
- সব রকমের নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস পরিত্যাগ করতে হবে।

এভাবে সারা জীবন ধরে আল্লাহর দীনের জন্য কাজ করে হযরত ইদরীস (আ) দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন। আমাদেরও উচিত সারা জীবন আল্লাহর দীনের জন্য কাজ করা। তাহলে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গাতেই আমরা সুখী হতে পারবো।

অনুশীলনী

১। হযরত ইদরীস (আ) কে ছিলেন? তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

২। বাল্যকালে তিনি কার কাছে শিক্ষা লাভ করেছিলেন?

৩। নবুওয়াত লাভের পূর্বে তিনি কিভাবে জীবন যাপন করতেন?

৪। নবুওয়াত দান করার পর আল্লাহ তাঁকে কি আদেশ করলেন? তিনি তখন কি করলেন?

৫। তিনি হিজরত করলেন কেন? হিজরত করে কোথায় গেলেন?

৬। মিসরে গিয়ে তিনি লোকজনকে কি বুঝালেন? ফলাফল কিরূপ হয়েছিল?

৭। হযরত ইদরীস (আ) এর শিক্ষা গ্রহণ করার পর লোকদের জীবনে কি পরিবর্তন এসেছিল?

৮। হযরত ইদরীস (আ) এর কীর্তিগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

৯। তাঁর শিক্ষার সার- কথাগুলো কি?

১০। তুমি কি হযরত ইদরীসকে (আ) পছন্দ করো? কেন?

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম

জন্মস্থান

প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহ, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, ইতিহাস ও পবিত্র কুরআন মজীদের ইংগিত থেকে যা জানা যায় তাতে একথা সুস্পষ্ট ভাবে বলা যায় যে, আধুনিক কালের ইরাকই ছিল হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কওমের আবাসভূমি এবং ইরাকের মুসেল ও কুর্দিস্তান এবং আর্মেনিয়ার মধ্যবর্তী কোন একটি স্থান ছিল তার জন্মস্থান।

হযরত আদম (আ) এর ইনতিকালের পর অনেক দিন কেটে গেল। তাঁর ছেলেমেয়েদের বংশবৃদ্ধি হল। পৃথিবীতে এখন অনেক লোক। আদম (আ) ছিলেন আল্লাহর নবী। আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে পৃথিবীতে জীবন যাপনের সব নিয়ম-কানুন তিনি জানতে পারতেন এবং সে ভাবে জীবন যাপন করতেন। তাঁর ইনতিকালের পর তার বংশধররা বহুদিন পর্যন্ত ঐ সব নিয়ম-মেনে পৃথিবীতে বসবাস করতে থাকলো। কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আয়ালার হুকুম আহকাম মানার ব্যাপারে শিথিলতা দেখা দিল। ধীরে ধীরে তারা নির্জেদের মনগড়া নিয়ম কানুনের প্রতি ঝুঁকে পড়লো। আল্লাহর দেয়া আইন কানুনের চর্চা ও অনুশীলন না থাকায় তা তাদের মধ্য থেকে হারিয়ে গেল। এভাবে সমাজে এক আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের প্রতি বিদ্রোহের অবস্থা সৃষ্টি হলো এবং তারা নিজেদের ইচ্ছামত চলতে শুরু করলো।

তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে হযরত নূহ (আ)-কে রসূল করে পাঠালেন। তিনি যখন রসূল হয়ে এলেন তখন লোকেরা ভুলে গিয়েছিল যে, শুধু আল্লাহকেই ইলাহ বা রব বলে মানতে হবে, তাঁর ছাড়া আর কারো আইন মানা যাবে না। একমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে হবে। নবী ও রসূলদের কাজ হলো মানুষকে হিদায়াতের পথের দিকে ডাকা। হযরত নূহ (আ) তাঁর কওমের লোকদের আল্লাহর পথে আহবান জানালেন। তিনি তার কওমের সামনে যে দাওয়াত পেশ করলেন তাহলো:

১. এক আল্লাহর দাসত্ব। অর্থাৎ অন্য সব কিছুর দাসত্ব ও পূজা-অর্চনা ছেড়ে আল্লাহকে উপাস্য মেনে নিয়ে কেবল তার হুকুম মেনে চলো।

২. তাকওয়া বা খোদাভীতির পথ গ্রহণ করো। অর্থাৎ যে সব কাজে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এবং তার গযব অবধারিত হয়ে যায় তা পরিত্যাগ করো জীবনের এমন পথ গ্রহণ করো যা খোদাভীরু লোকদের করা উচিত।

৩. আমার আনুগত্য করো। অর্থাৎ আল্লাহর রসূল হিসেবে যে সব আদেশ আমি তোমাদের দিচ্ছি তা মেনে চলো।

হযরত নূহ (আ) দীর্ঘ নয়শত পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তাঁর কওমের লোকদের এ সব কথা মেনে নিতে আহবান জানালেন। কিন্তু তারা হযরত নূহ (আ) এর সাথে অত্যন্ত নির্দয় ব্যবহার করলো। তারা তাঁর কথা শুনলো না। তাঁকে বিদ্রুপ করলো, গালি দিল, কষ্ট দিল এবং নানাভাবে অত্যাচার করলো। তিনি যতই তাদের বুঝাতেন তারা ততই বিগড়ে যেত।

পবিত্র কুরআনে নূহ (আ) এর কাহিনী এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

নূহের কওম রসূলদের অস্বীকার করলো যখন তিনি তাদেরকে বললেনঃ তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করোনা? আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত একজন আমানতদার রসূল। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। একাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইনা। আমাকে প্রতিদান দেয়ার দায়িত্ব বিশ্বজাহানের রবের। অতএব আল্লাহকে ভয় করো এবং দ্বিধাহীনচিত্তে আমার আনুগত্য করো। তারা জবাব দিলো, আমরা কি তোমাকে মেনে নেব, অথচ দেখছি নিকৃষ্ট লোকেরাই তোমাকে অনুসরণ করছে? নূহ বললেন, তাদের কাজকর্ম কেমন সে বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান নেই। তাদের কাজকর্মের হিসেব গ্রহণ করা তো আমার প্রতিপালকের কাজ। হায়! তা যদি তোমরা বুঝতে। ঈমান গ্রহণকারীদের তাড়িয়ে দেয়া আমার কাজ নয়। আমিতো একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। তারা বলল হে নূহ, যদি তুমি বিরত না হও তাহলে অবশ্যই বিপর্যস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। নূহ বললেনঃ হে আমার রব আমার কওম আমাকে অস্বীকার করেছে। এখন আমার ও তাদের মাঝে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দাও এবং আমাকে ও আমার সাথে যেসব ঈমানদার আছে তাদেরকে রক্ষা করো। শেষ পর্যন্ত আমি পূর্ণ বোঝাই একটি নৌযানে করে তাকে ও তার সাথীদের রক্ষা করলাম এবং অবশিষ্টদের ডুবিয়ে দিলাম। (সূরা আশ্-শুআরা, আয়াত- ১০৬-১১৯)

ওপরে উল্লেখিত আয়াতসমূহে সংক্ষেপে নূহ (আ) ও তার কওমের লোকদের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। এ সব আয়াত ও ইতিহাস থেকে আমরা যা জানতে পারি তাহলো- নূহ (আ) এর কওম যখন আল্লাহ ও তার রসূলদের শিক্ষা ভুলে চরম গোমরাহীতে নিমজ্জিত, ঠিক সেই সময় আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে হযরত নূহ (আ) কে রসূল করে প্রেরণ করলেন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রসূলদেরকে যে মূল দায়িত্ব দেয়া হয় তাহলো পথভ্রষ্ট মানুষকে সঠিক পথে নিয়ে আসা। অর্থাৎ ভাল কাজ করতে বলা ও ভাল কাজের শিক্ষা দেয়া এবং মন্দ কাজে বারণ করা ও মন্দকাজের কুফল সম্পর্কে সতর্ক করা। কোন কাজ ভাল আর কোন কাজ মন্দ অর্থাৎ কোন কাজ মানুষের জন্য কল্যাণকর ও কোন কাজ অকল্যাণকর তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

কারণ জ্ঞান ও কল্যাণের উৎস একমাত্র মহান আল্লাহ। নবী ও রসূলগণ মহান আল্লাহর নিকট থেকে সরাসরি জ্ঞান লাভ করে থাকেন এবং সে জ্ঞানের ভিত্তিতেই মানুষকে সৎ ও সুন্দর জীবন গড়ার জন্য আহবান জানান।

নবুওয়াত লাভ ও দাওয়াতের কাজ শুরু

নবুওয়াত প্রাপ্তির পর নূহ (আ) তার কওমের লোকদের বললেনঃ আমি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ আমাকে তোমাদের জন্য রসূল করে পাঠিয়েছেন। অতএব তোমরা আমার আনুগত্য করো। আমি তোমাদেরকে যা বলছি তা মেনে নাও। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। কেবল তারই ইবাদত করো। সমাজের সবাই তার আইন ও হুকুম মেনে নাও। তার দেয়া শিক্ষা অনুসারে জীবন, পরিবার ও সমাজ পরিচালনা করো। অন্যথায় পরিনাম তোমাদের কারো জন্যই ভাল হবে না।'

নূহ (আ) এর কওম যে সব দেব দেবীর আরাধনা ও পূজা-অর্চনা করতো তা সংখ্যায় ছিল একাধিক। এদের পাঁচজন দেব-দেবীর নাম কুরআন মজীদের সূরা 'নূহ' এর ২৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এরা হলোঃ ওয়াদ্দ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক, ও নাস্‌র। জাহেলী যুগে আরবের বিভিন্ন গোত্র এসব দেব-দেবীর নামে প্রতিমা তৈরী করে পূজা করতে শুরু করে। সুতরাং কুদ্বা'আ গোত্রের 'বনী কালব' শাখার উপাস্য দেবতা ছিল 'ওয়াদ্দ'। দাওমাতুল জানদাল নামক স্থানে এর মন্দির ছিল। হুযাইল গোত্রের দেবী ছিল 'সুওয়া'। এর মন্দির ছিল ইয়াম্বু'র অদূরে 'রুহাত' নামক স্থানে। 'তায়' গোত্রের আন'উম শাখা এবং 'মাজহিজ' গোত্রের কোন কোন শাখার দেবতা ছিল 'ইয়াগুস'। এর আকৃতি ছিল সিংহের ন্যায়। ইয়ামান ও হিজাযের মধ্যবর্তী জুরাশ নামক স্থানে নির্মিত একটি মন্দিরে এর মূর্তি স্থাপিত ছিল। ইয়ামানের হামদান এলাকার হামদান গোত্রের খায়ওয়ান শাখার উপাস্য দেবতা ছিল ইয়া'উক। এর আকৃতি ছিল অশ্ব সদৃশ। নাসর ছিল হিমইয়ার এলাকার হিমইয়ার গোত্রের যুলকুলা, উপগোত্রের দেবতা। এর আকৃতি ছিল শকুনের ন্যায়। বালখা নামক স্থানে নির্মিত মন্দিরে এর মূর্তি স্থাপিত ছিল। ধারণা করা হয়ে থাকে যে, মহাপ্লাবনে নূহ (আ) এর মূর্তিপূজক কওমের ধ্বংস হওয়ার পর এসব দেব-দেবীদের নাম কোনভাবে মূতি-পূজারী এসব আরব গোত্রের কাছে পৌঁচেছিল এবং তারা এসব মূর্তি বানিয়ে পূজা করতে শুরু করেছিলো।

তিনি কওমকে মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করতে বললেন

আল্লাহর ইবাদত করা ও নিজের আনুগত্য করতে বলার সাথে সাথে নূহ (আ) তাদেরকে দেব-দেবী ও মূর্তিপূজা ছেড়ে দিতেও আহবান জানালেন। কিন্তু কওমের লোকজন তার এ কথার প্রতি কর্ণপাত করতে আদৌ রাজি হলো না। তারা কওমের লোকজনকে ডেকে বলে দিলো, নূহের কথায় তোমরা তোমাদের দেব-দেবী ওয়াদ্দ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়া'উক ও নাস্‌র এর উপাসনা ছেড়ে দিওনা। কিন্তু নূহ (আ) তার দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে থাকলেন। তিনি রাত দিন একাকার করে এক আল্লাহর উপাসনার যুক্তি ও উপকারিতা বুঝাতে থাকলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রত্যেক মানুষকে আহবান জানালেন। তার এ প্রচেষ্টার ফলে সমাজের মুষ্টিমেয় দরিদ্র ও প্রভাবহীন লোক তার ডাকে সাড়া দিয়ে ঈমান আনলো।

সমাজের নেতাদের বিরোধিতা

সমাজের প্রভাবশালী ও বিত্তবান লোকেরা দেখলো যে, নূহ (আ) যেভাবে মানুষকে আহবান জানাচ্ছেন তাতে হয়তো তার প্রচেষ্টা সফলতা লাভ করতে সক্ষম হবে। তাই তারা তাকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য নানা রকমের ষড়যন্ত্র ও ফন্দি-ফিকিরের মাধ্যমে এই বলে লোকজনকে বিভ্রান্ত করতে থাকলো যে, তোমরা নূহের কথায় বিশ্বাস করো না। কারন, ফেরেশতা ছাড়া কেউ নবী-রসূল হতে পারে না। নূহ আমাদের মতই একজন মানুষ। আমাদের যেমন খাওয়ার ও পান করার দরকার হয় তারও তেমনি খাওয়ার ও পান করার দরকার হয়। অতএব সে নবী নয়। তারা আরো একটা যুক্তি দাঁড় করালো যে, যারা নূহ (আ)কে নবী বলে মেনে নিয়ে তার কথায় চলছে তারা আমাদের সমাজের দুর্বল, অর্থ-বিত্তহীন দরিদ্র, শ্রমিক, কৃষক ও ছোটখাটো পেশাজীবী মানুষ। সমাজের ধনাঢ্য-বিত্তশালী, মর্যাদাবান ও প্রভাবশালী জ্ঞানীগুণী লোকেরা কেউই তার সাথে নেই। আমরা মর্যাদাবান লোকেরা ঐসব গরীব ও নিচু পর্যায়ের লোকদের সাথে মিশতে পারি না। নূহ যদি তাদেরকে তার কাছ থেকে তাড়িয়ে দেয় তাহলে তার কথা মানা হবে কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে। এ ছাড়াও তারা তাকে না মানার অজুহাত হিসেবে আরো একটা কথা বলতে থাকলো যে নূহ (আ) যা বলছে তা সত্য নয়। সে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে।

নূহ (আ) দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত হলেন না

শত বাধা সত্বেও নূহ (আ) তার কাজ বন্ধ করলেন না। বরং তিনি তার কাজের গতি বাড়িয়ে দিলেন। তিনি তাদের সামনে যুক্তি পেশ করে বললেন, আল্লাহ যদি আমাকে তার রহমতে নবুওয়াত দান করে থাকেন আর আমার কাছে যদি এর সপক্ষে যুক্তি থাকে তাহলে কি তোমরা আমার কথা মানবে না এবং আমাকে নবী বলে স্বীকার করবে না? এ কাজে তো আমার কোন পার্থিব স্বার্থ নেই। তা ছাড়া নবুওয়াত লাভের পূর্ব পর্যন্ত আমি তোমাদের কাছে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলাম। এখন হঠাৎ করে কিভাবে অবিশ্বাসী হয়ে গেলাম? তোমাদের অজ্ঞতা ধন-সম্পদের গর্ব ও আত্ম অহংকারই বরং এ পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি তোমাদেরকে বলছিনা যে, আমার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সব কিছুর ভান্ডার দেয়া হয়েছে যা আমি ইচ্ছামত ব্যয় করতে পারি। আমি বলছিনা যে, আমি গায়েবের খবরও জানি। আমি একথাও বলছিনা যে, আমি ফেরেশতা। আমি যা বলছি তাহলো, আমি আল্লাহর নবী। তোমাদের সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালনার জন্য আমার কাছে দিকনির্দেশনা আছে সেগুলো মেনে নাও। আর আমি যা বলছি তা যদি না মানো তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য আযাব নির্ধারিত হয়ে আছে। সে আযাব আসলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

কওমের লোকেরা হঠকারিতা দেখালো

প্রত্যেক নবী-রসূলই তার কওমের মানুষের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও স্নেহশীল হয়ে থাকেন। হযরত নূহ (আ)ও তার কওমের প্রতি অত্যন্ত দরদী ছিলেন। কওম ধ্বংস হয়ে যাক তা তিনি

কল্পনাও করতে পারতেন না। তাই নানাভাবে যুক্তিতর্ক পেশ করে তিনি তাদেরকে বুঝাতে সচেষ্ট ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের কথা শুনে তার কওমের মানুষ বিরক্ত ও রুষ্ট হয়ে উঠলো। তারা এবার হঠকারিতা করে বললো, হে নূহ, তুমি আমাদের সাথে অনেক তর্কবিতর্ক করেছো। বার বার একই কথা বলে আমাদের বিরক্ত করেছো। আমরা তোমাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি যে, আমরা তোমার কথা গ্রহণ করবো না। যে আযাবের ভয় তুমি দেখাচ্ছো পারলে তা নিয়ে আসো।

হতাশা নেমে এলো

নূহ (আ) এ দাওয়াতী কাজ চালিয়েছিলেন সুদীর্ঘ ৯৫০ বছর ব্যাপী। এত দীর্ঘকাল ধরে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ ও কাকুতি-মিনতি করেও যখন তিনি তার কওমের পক্ষ থেকে সাড়া পেলেন না বরং বিরোধিতা ও উগ্রতা ক্রমে ক্রমে বেড়ে শত্রুতায় পর্যবসিত হলো তখন তিনি তাদের ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে চূড়ান্তভাবে হতাশ হয়ে গেলেন। তার এই হতাশ হৃদয়ের একান্ত অভিব্যক্তি তিনি তার রব মহান আল্লাহর দরবারে পেশ করলেন। কুরআন মজীদে তা এভাবে ব্যক্ত হয়েছেঃ

হে আমার রব, আমি রাত দিন একাকার করে আমার কওমকে আহবান জানিয়েছি। কিন্তু আমার আহবান তাদের দূরে সরে যাওয়াকে কেবল বাড়িয়েই দিয়েছে। তুমি যাতে তাদেরকে ক্ষমা করে দাও এ উদ্দেশ্যে আমি যখনই তাদেরকে আহবান করেছি তখনই তারা কানে আঙ্গুল দিয়েছে এবং কাপড়ে মুখ ঢেকে নিয়েছে, নিজের আচরণে অনড় থেকেছে এবং চরম ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে উচ্চকণ্ঠে আহবান জানিয়েছি। তারপর প্রকাশ্যে তাদেরকে আহবান জানিয়েছি এবং গোপনে চুপেচুপেও বুঝিয়েছি। বলেছি, তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও। নিসন্দেহে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল। (সূরা- নূহ, আয়াত- ৬-১০)

নূহ (আ) এর করুণ ফরিয়াদ শুনে আল্লাহ তা'আলা তাকে জানিয়ে দিলেনঃ হে নূহ এ পর্যন্ত যারা তোমার প্রতি ঈমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার কওমের আর কেউ ঈমান আনবে না। তাই তাদের এ আচরণে দুঃখ করোনা। (সূরা হুদ, আয়াত-৩৬)

মহাপ্লাবন

হযরত নূহ (আ) যখন দেখলেন যে, তার জাতির ঈমান গ্রহণের আর কোন সম্ভাবনা নেই বরং তারা আল্লাহ ও তার রসূলের বিরোধিতার কোন সুযোগই হাত ছাড়া করেনা, মূর্তিপূজাসহ সব রকম অন্যায় ও অনৈতিক কাজের পৃষ্ঠপোষকতা করতে অতিমাত্রায় তৎপর তখন তিনি চিন্তা করলেন যে, এ জাতির ধ্বংস হয়ে যাওয়া উচিত। কারণ তাদের দ্বারা এ পৃথিবীতে যখন আর কোন কল্যাণকর কাজ হবে না বরং ধ্বংস ও বিপর্যয় সৃষ্টি হবে তখন তাদের আল্লাহর এ পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকার কোন যুক্তি নেই। তাই তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেনঃ

হে প্রভু, তুমি কাফেরদের কাউকেই আর এ পৃথিবীতে অবশিষ্ট রেখোনা। তুমি যদি তাদেরকে এভাবেই ছেড়ে দাও তাহলে তারা তোমার বান্দাদেরকে গোমরাহ করে ফেলবে এবং তাদের বংশধর যারা জন্ম লাভ করবে তারাও তাদের মত পাপাচারি ও কাফের হবে। (সূরা নূহ, আয়াত-১৬, ১৭)

নূহ (আ)-কে আযাবের সিদ্ধান্ত জানানো হলো

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নূহ আলাইহিস সালামের দো'য়া কবুল করলেন এবং অহীর মাধ্যমে তাকে জানিয়ে দিলেন যে, অতি সত্বর তার কওমের পাপাচারি ও খোদ্রোহীদেরকে প্লাবন দিয়ে ডুবিয়ে ধ্বংস করবেন। মুক্তি পাবেন শুধু তিনি নিজে এবং যারা তার প্রতি ঈমান এনে সৎ জীবন যাপন করছে তারা। যেহেতু প্লাবনের মাধ্যমে পাপিষ্ঠদের ধ্বংস করা হবে তাই হযরত নূহ (আ) ও তার সংগী ঈমানদারদের রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তাআলা হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে পূর্বাহ্নেই একটি বৃহত জাহাজ তৈরির জন্য নির্দেশ দিলেন। আল্লাহর নির্দেশ মত নূহ (আ) প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে জাহাজ নির্মাণ শুরু করলেন। কাফেররা জানতে পারলো তার জাহাজ তৈরির উদ্দেশ্য। কিন্তু তারা আদৌ বিশ্বাস করতে পারলো না যে, তাদের এলাকায় এমন কোন প্লাবন আসতে পারে যা থেকে আত্মরক্ষার জন্য জাহাজ নির্মাণের প্রয়োজন হতে পারে। তাই তারা নূহ আলাইহিস সালামের এ কাজে বিস্ময় প্রকাশ করলো এবং তাকে বিদ্রূপ ও হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করলো। যখনই তাদের হযরত নূহ (আ) এর সাথে স্বাক্ষাত হতো তখনই তারা তাকে বিদ্রূপাত্মক ও তির্যক কিছু কথা শুনিয়ে দিতো। জবাবে হযরত নূহ (আ) তাদেরকে বলতেনঃ আজ তোমরা যেমন আমাদেরকে বিদ্রূপ করছো আমরা ঠিক তেমনি একদিন তোমাদেরকে বিদ্রূপ করবো এবং সে সময় অনতিবিলম্বেই আসবে।'

মহাপ্লাবনের সূচনা

হযরত নূহ আলাইহিস সালামের জাহাজ নির্মাণ শেষ হওয়ার অল্প দিন পরেই মাটি থেকে পানির ফোয়ারা ফুটে বের হতে শুরু হলো। অবশ্য আল্লাহ তাআলা আগেই হযরত নূহ (আ)-কে প্লাবন শুরু হওয়ার কিছু পূর্ব লক্ষণ জানিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে প্লাবন শুরু হলে ঈমানদার সকল নারী-পুরুষকে এবং প্রতিটি জীব-জন্তুর একটি করে জোড়া জাহাজে উঠিয়ে নিতে হবে, আল্লাহ তাকে আরো নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, প্লাবন শুরু হলে কাফেরদের মাগফিরাতের জন্য কোন দোয়া করা যাবে না এবং অবাধ্য স্ত্রী ও সন্তানকে জাহাজে উঠিয়ে নেয়া যাবে না। এবার প্লাবন শুরু হতে দেখে হযরত নূহ (আ) আল্লাহর নির্দেশ মত তার পরিবারের লোকজন এবং যে নগন্য সংখ্যক মানুষ ঈমান এনেছিলেন তাদেরকে সহ কিছু গৃহপালিত জীবজন্তুও জাহাজে উঠিয়ে নিলেন। কিন্তু তার এক স্ত্রী ও এক পুত্রকে আল্লাহর নির্দেশ মত জাহাজে উঠতে আহবান জানালেন না। জাহাজে আরোহনের পর তারা আল্লাহর নাম নিয়ে জাহাজ ভাসিয়ে দিলেন। ঐ

এলাকার সমস্ত ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ হয়ে ফোয়ারার মত অসংখ্য ঝর্ণাধারা ফুটে বের হয়ে পানি উপচে পড়তে শুরু হলো। একই সময়ে আকাশ থেকেও মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ হতে থাকলো এবং একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত অব্যাহত রইলো। সমকালীন মানব বসতির পুরোটাই অথৈ পানির নিচে তলিয়ে গেল। সব মানুষ এবং জীব-জন্তু ডুবে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। কেবল নূহ আলাইহিস সালামের আরোহী মানুষ এবং জীবকুল রক্ষা পেল। চল্লিশ দিন পর্যন্ত জাহাজ পানির ওপরে ভেসে বেড়াতে থাকলো।

জাহাজ জুদী পাহাড় শীর্ষে থামলো

এ মহাপ্লাবন চল্লিশ দিন ব্যাপী স্থায়ী হওয়ার কারণে জাহাজের আরোহীরা ছাড়া সবাই ডুবে মারা গেল। এবার আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ ক্রমশ স্তিমিত হয়ে থেমে গেল এবং ভুঅভ্যন্তর থেকেও পানি উপচে ওঠা বন্ধ হলো মাটি ধীরে ধীরে পানি শুষে নিল এবং জাহাজ এক পর্যায়ে গিয়ে জুদী পাহাড় শীর্ষে থেমে গেল। ভূপৃষ্ঠ চলাচলের উপযোগী হলে হযরত নূহ (আ) তার ঈমানদার সংগী-সাথীদের নিয়ে জাহাজ থেকে বেরিয়ে সমতল ভূমিতে নেমে এলেন। পৃথিবীতে পুনরায় নতুন করে মানুষের জীবনযাত্রা শুরু হলো। নতুন করে জনপদ, শহর ও নগর গড়ে উঠলো। মানুষের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো।

নূহ (আ) এর পুত্রও ডুবে মারা গেল

হযরত নূহ আলাইহিস সালামের জীবনেতিহাসের একটি বিষয় অত্যন্ত শিক্ষণীয় যে, এই প্লাবনে তার এক সন্তানও ডুবে মারা যায়। ইতিহাসে তাঁর ঐ সন্তানের নাম কিনআন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সে ছিল কাফের। সেও নবী হিসেবে হযরত নূহকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে প্লাবনে ডুবে মারা যায়।

প্লাবন শুরু হলে নূহ (আ) তার পরিবারের লোকজন ও অন্যান্য ঈমানদারগণ জাহাজে আরোহন করলেও তার সেই পুত্র ঈমান গ্রহণ করে জাহাজে আরোহন করতে অস্বীকার করে। সে বলে, আমি কোন একটি পাহাড় চূড়ায় উঠে আশ্রয় নেব তাহলে প্লাবনে আমার কোন ক্ষতি হবে না। নূহ (আ) তাকে বললেন আজকে আল্লাহর এ গযব থেকে কেউ রক্ষা পাবে না। পিতাপুত্রের এভাবে কথাবার্তা চলাকালে একটি বড় তরঙ্গ এসে পিতাপুত্রকে পরস্পর বিছিন্ন করে ফেলে এবং সে ডুবে মারা যায়। হযরত নূহ (আ) সেই সময় আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলেনঃ হে আল্লাহ, আমার পুত্রতো আমার পরিবারভূক্ত। তোমার প্রতিশ্রুতি তো সত্য। তুমি বলেছো আমার পরিবারের লোকেরা রক্ষা পাবে। জবাবে আল্লাহ তাকে জানিয়ে দিলেন সে তোমার পরিবারের কেউ নয়। কারণ তার আমল বা জীবনাচার ঈমানদারের জীবনাচার নয়। অতএব তার জন্য আমার কাছে কোন প্রার্থনা জানাবে না। অন্যথায় তুমিও জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

এ ঘটনা থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই তা হচ্ছে, আল্লাহর নিকট কেবল ঈমান এবং সৎকাজই গ্রহণযোগ্য। ঈমান না থাকলে পিতা নবী হয়েও কোন লাভ নেই। ঈমানের সম্পর্কই প্রকৃত এবং দৃঢ় সম্পর্ক।

মহাপ্লাবনের পরবর্তী অবস্থা

ইতিহাস থেকে জানা যায় মহাপ্লাবনের পর নূহ আলাইহিস সালাম আরো ৩৫০ বছর জীবিত ছিলেন। এ সময়েরও পুরোটাই তিনি নবুওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লাহর এই মহান নবীর জীবন থেকে আমরা বহু কিছু শিখতে পারি।

অনুশীলনী

১। হযরত নূহ (আ) যে সময় রসূল হয়ে আসেন তখনকার লোকেরা কেমন ছিল?

২। নূহ (আ) তাঁর কওমের লোকদের কি বললেন? লোকেরা তখন কি করলো?

৩। লোকেরা নূহ (আ)-কে কিভাবে কষ্ট দিয়েছিল।

৪। মহাপ্লাবন কিভাবে হয়েছিল? কারা এই প্লাবন থেকে রক্ষা পেয়েছিল?

৫। প্লাবনের পর নূহ (আ) কত দিন বেঁচে ছিলেন?

৬। নূহ (আ)-এর কয়টি সন্তান ছিল? তাদের নাম বল। কিন'আন ডুবে মরলো কেন?

৭। নূহ (আ) কত দিন বেঁচে ছিলেন?

হযরত হূদ আলাইহিস সালাম

আরবের প্রাচীন অধিবাসীদেরকে ঐতিহাসিকগণ (ক) আরব বায়েদা, (খ) আরব আরেবা ও (গ) আরব মুসতা'রিবা এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। আরব বায়েদার অন্তর্ভুক্ত আরবদের সংখ্যা ছিল অনেক এবং এরা আবার বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। আদ ও সামুদ জাতি এদেরই অংশ। আদ জাতির বংশধারা উপর দিকে গিয়ে এরাম এর সাথে মিলিত হয়েছে। সামুদ এর বংশধারাও একইভাবে 'এরাম' পর্যন্ত গিয়ে পৌঁচেছে। এরাম হচ্ছে নূহ (আ) এর পুত্র সামের সন্তান। বায়েদা শব্দের অর্থ হচ্ছে ধ্বংসপ্রাপ্ত। যেহেতু এ শ্রেণীর আরবরা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তাই এদেরকে 'বায়েদা' বলা হয়।

ঐতিহাসিকগণ আদ জাতিকে দু' ভাগে ভাগ করেছেন। তারা হলো: 'আদ আল 'উলা' বা প্রথম আদ এবং 'আদ আস সানিয়া' বা দ্বিতীয় আদ। আদ আল 'উলা ছিল শক্তিমত্তা ও ক্ষমতার দিক থেকে পৃথিবীর বৃহৎ জাতিগুলোর একটি। তাদের অধস্তন উপগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল এক হাজারেরও অধিক। কুরআন মজীদের সূরা আন নাজমের ৫০ ও ৫১ আয়াতে এদের ধ্বংস করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে যে, আল্লাহ তাআলা আদ-আল 'উলা ও সামুদকে ধ্বংস করেছেন। তাদের কেউ আর এখন অবশিষ্ট নেই।

আদ জাতির আবাসভূমি

আবাসভূমি আরবের সর্বদক্ষিণে হাদরামাওত এলাকার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে আছে এক বিশাল মরুভূমি। এখানে মানব বসতির চিহ্ন পর্যন্ত নেই। কোন গাছপালা বা লতাগুল্ম জন্মেনা। শত শত মাইলব্যাপী শুধু ধু ধু মিহি বালুকণা দ্বারা গঠিত বালিয়াড়ি। বর্তমান সময়েও সেখানে কোন মানুষ যেতে ভয় পায়। কারন এ এলাকায় গেলে কেউ আর ফিরে আসতে পারে না। শুভ্র মিহি বালুর সমুদ্রে তলিয়ে অবশেষে প্রাণ হারায়। ভৌগলিক ও আবহাওয়াবিদদের ধারণা হাজার হাজার বছর আগে এলাকাটা উর্বর ও জনবসতিপূর্ণ ছিল। পরবর্তীকালে আবহাওয়ার ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। এটিই হচ্ছে পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত "আহকাফ" এলাকা এবং এ এলাকাই ছিল 'আদ' জাতির আবাসভূমি।

আদ জাতির দৈহিক কাঠামো ও শক্তিমত্তা

নূহ আলাইহিস সালামের কওমকে মহাপ্লাবন দিয়ে ধ্বংস করার পর আল্লাহ তা'আলা আদ জাতিকে পৃথিবীতে প্রতিপত্তি দান করলেন। তাদের দৈহিক গঠন ছিল অত্যন্ত মজবুত। তারা ছিল সুস্বাস্থ্য ও অতুলনীয় দৈহিক শক্তির অধিকারী। যদিও "আহক্বাফ" এলাকা ছিল তাদের আদি বাসস্থান তবুও উন্নতির যুগে শক্তির দাপটে তারা ইয়ামানের পশ্চিমের সমূদ্র তীরবর্তী ওমান ও হাদরামাওত থেকে ইরাক পর্যন্ত তাদের প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাদের যে দৈহিক শক্তি ও বলবীর্য ছিল তাতে সে সময়ে তাদের সাথে পাল্লা দেয়ার মত আর কোন জাতি ছিল না। তাই তারা গর্ব করে বলতো, আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী আর কে আছে? তাদের এ গর্বিত উক্তির কথা কুরআন মজীদেও উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কে কুরআন মজীদে আরো বলা

হয়েছে 'আদ' জাতি ন্যায় ও সত্যের পথ থেকে সরে গিয়ে এ পৃথিবীতে বড় অহংকারী হয়ে উঠলো। তারা আল্লাহ ও রসূলদের অস্বীকার করে বসলো এবং অত্যাচারী ও সীমা লজ্ঘনকারীদের অনুসরণ করলো।

সভ্যতা ও তমুদ্দুন

তৎকালীন সভ্যতা ও তমুদ্দুনের দিক দিয়েও তারা ছিল তখনকার জাতিসমূহের মধ্যে সেরা। তাদের জীবন যাপনের মান ছিল খুব উন্নত। স্থাপত্য শিল্প তথা ঘরবাড়ি ও দালান কোঠা নির্মাণের বেলায় তাদের চেয়ে দক্ষ ও পারদর্শী আর কোন জাতি ছিল না। তারা বড় বড় দালান কোঠা তৈরী করতে পারতো। বড় বড় স্তম্ভের ওপর তারা এসব দালান-কোঠা তৈরী করতো। এ জন্য সে সময় তারা খুব নামকরা জাতি হিসেবে পরিচিত ছিল।

শাসক গোষ্ঠী

তাদের শাসনের দায়িত্ব বা রাষ্ট্র পরিচালনার ভার ছিল কিছু সংখ্যক জালেম ও অত্যাচারী লোকের হাতে। তারা যা করতো তা ন্যায় হোক বা অন্যায় হোক সবাইকে মেনে নিতে হতো। আপত্তি করাতো দূরের কথা কেউ টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত করতে পারতো না। এ সম্পর্কেও কুরআন শরীফে বলা হয়েছেঃ 'আর আদ জাতি জালেম, অত্যাচারী এবং ন্যায় ও সত্যের দুশমনদের কথা মেনে চলতো।'

এ 'আদ' জাতি কিন্তু আল্লাহকে অস্বীকার করতো না। তবে আল্লাহকে অস্বীকার না করলেও তারা ছিল মুশরিক। তারা তিনটি দেবমূর্তির পূজা করতো। এসব মূর্তির নাম ছিল ছাফা, সামুদ ও হাবা। এ ছাড়া অনেক জিনিসকেই তারা আল্লাহর সাথে শরীক করতো। যে সব জিনিসকে তারা আল্লাহর শরীক মনে করতো তারা তার মূর্তি তৈরী করতো। এ সব মূর্তির আবার পূজাও তারা করতো। নূহের (আ)- কওমের মত তারা মূর্তি নির্মাণে খুব পারদর্শী ছিল। আশেপাশের অনেক এলাকা দখল করে তারা ওই সব এলাকার লোকদের এ সব মূর্তি পূজা করতে বাধ্য করতো। তারা সবল ও প্রভাবশালী লোকদের কিছু বলতো না কিন্তু দুর্বলদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাতো।

হযরত হূদ আলাইহিস সালাম নবী হয়ে আসলেন

এ ভাবে ক্ষমতা, প্রচুর অর্থ-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করে জুলুম-উৎপীড়নে যখন তারা সীমা ছাড়িয়ে গেলো তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সৎ পথে আনার জন্য হূদ আলাইহিস সালামকে নবী করে তাদের কাছে পাঠালেন। নবুওয়াত লাভ করে হযরত হূদ (আ) তাদের বললেনঃ "আল্লাহ তা'আলা আমাকে নবী করে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। আমার কাজ হলো আল্লাহর হুকুম-আহকাম তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া। আল্লাহর হুকুম মত চললে সব দিক দিয়ে তোমাদের ভাল হবে। তোমরা একমাত্র আল্লাহকে প্রভু বলে স্বীকার করো। তাঁর সব হুকুম মেনে নাও। আর কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করো না। আর আমাকে তাঁর নবী হিসেবে

মেনে নাও। এ সব কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমি একমাত্র আল্লাহর কাছে পুরস্কার চাই।"

কিন্তু 'আদ' জাতির কাছে ছিল অঢেল সম্পদ। তাদের কোন কিছুর অভাব ছিল না। তাদের ছিল সুউচ্চ প্রাসাদ, শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মজবুত দুর্গ, বিরাট বিরাট ফলের বাগান, ফসলের খামার এবং পাহাড়ী ঝর্ণার সুপেয় পানি। তারা এ সবের মধ্যে ডুবে ছিল। তাই তারা নবীর কথা শুনলো না। তারা আল্লাহর নবী হুদ (আ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। আদ কওমের নেতারা বললো: তুমি মিথ্যা কথা বলছো। আর আমরা দেখতে পাচ্ছি তুমি একজন নিরেট বোকা ছাড়া আর কিছুই নও। কারণ তুমি দুনিয়ার এ সব ভোগ বিলাসের জিনিস চাও না। অথচ এগুলো কে না চায়?

এ কথা শুনে হযরত হূদ (আ) তাদের বললেনঃ হে আমার কওমের ভাইয়েরা, আমি কোন বোকা মানুষ নই। বরং আমি আল্লাহর একজন রসূল। আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর নির্দেশ পৌঁছিয়ে দিচ্ছি মাত্র। তোমরা আমাকে তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত উপদেশ দাতা বলতে পারো। তোমরা হয়তো এই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছো যে, তোমাদের কওমের একজন লোক আল্লাহর রসূল হয়েছেন। আর তিনিই আজ তোমাদের আল্লাহর কথা শুনাচ্ছেন। কিন্তু আশ্চর্য হওয়ার কিছুই এতে নেই। আমি যা বলছি তা একটু চিন্তা-ভাবনা করে দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে। সুতরাং আমি আবারো বলছিঃ আল্লাহ তোমাদের যে সব নিয়ামত দান করেছেন সে জন্য আল্লাহর শোকর গোজারী করো।

এ কথার জবাবে আদ কওমের নেতারা বললোঃ তুমি আমাদের কাছে কি শুধু এ উদ্দেশ্যে এসেছো যে, একমাত্র আল্লাহকে আমরা মেনে চলি? আর আমাদের বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষেরা যে সব মূর্তির পূজা করেছে তার পূজা করা ছেড়ে দেই? আমরা তা কখনো করতে পারবো না। তুমি আমাদের যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে এসো। তাহলেই প্রমাণ হবে তুমি সত্যবাদী কিনা।

হযরত হূদ (আ) দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাঁর কওমকে আল্লাহর পথে আসার জন্য বুঝালেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি আরো বললেনঃ আজ তোমরা আল্লাহকে অস্বীকার করে যা করছো তার কারণে তোমাদের জন্য পরিণতি অপেক্ষা করছে। কিন্তু তারা হযরত হূদের (আ) কথায় মোটেই কর্ণপাত করলো না। অবশেষে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের জন্য আযাব নির্ধারিত হয়ে গেলো। প্রথমে পর পর কয়েক বছর তাদের এলাকায় অনাবৃষ্টি ও খরা চললো। ফলে তাদের মাঠের ফসলের খুব ক্ষতি হলো। হযরত হুদ (আ) এবারও তাদের বুঝিয়ে সাবধান হতে বললেন। কিন্তু এতেও তারা কর্ণপাত করলো না। তাই আল্লাহ তা'আলা চূড়ান্ত আযাব দিয়ে তাদের ধ্বংস করার ফয়সালা হযরত হূদ (আ)-কে জানিয়ে দিলেন।

একদিন তারা দেখল আকাশে বৃষ্টির মেঘ করেছে। একটু পরেই যেন তাদের এলাকার ওপর প্রবল বৃষ্টিপাত হবে। পরপর ক'বছর বৃষ্টি ছিল না। তাই বৃষ্টির এ মেঘ দেখে তারা খুব খুশী

হলো। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটা ছিল আল্লাহর আযাব। এ মেঘ থেকে এমন ঝড়-বৃষ্টি ও তুফান এসে তাদের ওপর আপতিত হলো যে তারা একজনও আর জীবিত থাকলো না। একাধারে আট দিন এবং সাত রাত পর্যন্ত প্রচন্ড বাতাস তাদের এলাকার ওপর দিয়ে বয়ে গেল। বাতাসের বেগ এত প্রচন্ড ছিল যে, ঘর-বাড়ি দালান-কোঠা সব ধূলিসাৎ হয়ে গেলো। প্রতিটি মানুষকে বাতাস যেন আছড়ে আছড়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে দিল। একমাত্র হযরত হূদ (আ) ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তারাই বেঁচে গেল। তাঁরা ছাড়া আর একটি লোকও বাঁচলো না।

আযাবে পতিত হয়ে কওম ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর হযরত হূদ (আ) ঈমানদারদের সাথে করে হাদরামাওত এলাকায় চলে গেলেন। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো তিনি সেখানেই কাটালেন। এখানেও তিনি লোকদের আল্লাহর পথে ডাকলেন। হাদরামাওতেই তিনি ইনতিকাল করেন। পূর্ব হাদরামাওতের 'তায়ীম' নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। হযরত হূদ (আ) সারা জীবন মানুষকে আল্লাহর পথে ডেকেছেন। আর এ কাজ করতে করতেই শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেছেন।

না-ফরমানীর কারণে আল্লাহ তা'আলা 'আদ জাতিকে এমন ভাবে ধ্বংস করেছেন যে, যে আহকাফ এলাকায় তারা বাস করতো সে এলাকায় আজ পর্যন্তও কোন মানুষের বসতি গড়ে ওঠেনি। এমনকি সেখানে একটি গাছ বা তৃণ-লতা পর্যন্ত জন্মায় না। কোন মানুষও সেখানে যেতে সাহস পায় না। এখন সেখানে আছে শুধু মিহি বালুকা রাশি। 'আদ' জাতির এ পরিণাম থেকে সকলের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

অনুশীলনী

১। আল-আহকাফ এলাকা কোথায় অবস্থিত?

২। 'আদ' জাতি কোথায় বাস করতো? তাদের দৈহিক গঠন কেমন ছিল?

৩। 'আদ' জাতি কিভাবে জীবন যাপন করতো? তাদের সভ্যতা ও তমদ্দুন কেমন ছিল?

৪। 'আদ' জাতি অহংকারী হয়ে উঠলো কেন? তাদের রাষ্ট্র বা শাসন ব্যবস্থা কারা পরিচালনা করতো? তারা কিরূপ ছিল?

৫। 'আদ' জাতি কিসের পূজা করতো? তাদের কাছে নবী হিসেবে কাকে পাঠানো হয়েছিল? কখন তিনি তাদের কাছে এসেছিলেন?

৬। হযরত হূদের (আ) সাথে 'আদ' জাতির নেতাদের কি কি কথাবার্তা বা বিতর্ক হয়েছিল?

৭। হযরত হূদ (আ) তাদেরকে কি বললেন? তিনি কি তাদেরকে কোন অন্যায় কথা বলেছিলেন?

৮। 'আদ জাতির ওপর আল্লাহর আযাব কিভাবে এসেছিল?

৯। কয়দিন পর্যন্ত আযাব চলেছিল? 'আদ' জাতি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর হযরত হূদ (আ) কি করলেন?

১০। 'আদ' জাতির পরিণাম থেকে আমাদের কি শিক্ষা নেয়া উচিত?

হযরত সালেহ্ আলাইহিস সালাম

আরবের উত্তর-পশ্চিমে আল-হিজর নামক একটি জায়গা আছে। এর আরেক নাম মাদায়েনে সালেহ। এখানে একটি প্রাচীন জাতি বাস করতো। এই জাতির নাম ছিল সামূদ। মদীনা এবং তাবুকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত সামূদ জাতির এই আবাস স্থানকেই প্রাচীন কালে আল-হিজর বলে উল্লেখ করা হতো। পবিত্র কুরআন মজীদে মাদায়েন ও আল-হিজর এ উভয় নামেরই উল্লেখ আছে।

পাপ ও গোনাহের কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে 'আদ' জাতিকে ধ্বংস করার পর আল্লাহ্ তা'আলা এই সামূদ জাতিকে প্রভাব প্রতিপত্তি দান করলেন। তারা বিভিন্ন দিক দিয়ে খুব উন্নতি লাভ করলো। তারা প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হয়ে অত্যন্ত বিলাসী জীবন যাপন করতে লাগলো। তারা পাহাড় কেটে কেটে যে বাসস্থান নির্মাণ করতো তা যেমন ছিল মজবুত তেমনি ছিল জাঁকজমক ও শান শওকতে ভরা। কিন্তু হলে কি হবে? অর্থ সম্পদ ও জাঁকজমক তাদের যতই বেড়ে চললো ততই তাদের মনুষ্যত্ব অর্থাৎ ভাল গুণাবলীর অভাব হতে লাগলো। তাদের এলাকার অতীতের যে সব চিহ্ন আজো টিঁকে আছে সেগুলো দেখলে তাদের যে কত ধন-সম্পদ ছিল এবং দুনিয়ায় তারা যে কত উন্নতি লাভ করেছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়।

তারা যতই উন্নতি লাভ করতে লাগলো ততই আল্লাহকে ভুলে যেতে থাকলো। এক আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালন না করে তারা মূর্তি তৈরী করে তার পূজা করতে লাগলো। কিছু সংখ্যক জালেম-অত্যাচারী লোক ছিলো তাদের নেতা। তাদের হুকুম মত এরা চলতো। তাদের সমাজে কোন প্রকার ন্যায় বিচার ছিল না। ধনী ও প্রভাবশালীদের সুযোগ-সুবিধা দেয়া হতো। আর গরীব ও দুর্বলদের প্রতি জুলুম করা হতো।

হযরত সালেহ (আ) তাদের কাছে নবী হয়ে এলেন

সামূদ জাতি যখন এ ধরনের জুলুম অত্যাচার ও অন্যায়ের মধ্যে ডুবে ছিল তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত সালেহ (আ)-কে নবী বানিয়ে তাদের কাছে পাঠালেন। নবুওয়াত লাভ করে হযরত সালেহ (আ) তাদের ভুল-ত্রুটি ও অন্যায় সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে থাকলেন। তিনি দেখলেন তারা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে অস্বীকার করে নিজেদের হাতে তৈরী মূর্তির পূজা করে। হযরত সালেহ (আ) তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতের কথা। তিনি তাদের বললেনঃ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত ও দাসত্ব করেই সৌভাগ্য লাভ এবং পরকালে নাজাত পাওয়া যাবে। তিনি তাদের একথা বুঝালেন যে, 'আদ' জাতিকে ধ্বংস করার পর মহান আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষার জন্য ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দান করেছেন। তিনি তাকওয়া বা পরহেজগারীর পথ গ্রহণ করতে বললেন। মূর্তি পূজা করতে নিষেধ করলেন। তিনি বললেনঃ তোমরা গরীব ও দুর্বলের প্রতি দয়া কর এবং অন্যায় কাজ ছেড়ে দাও। তোমরা তো চিরদিন এ দুনিয়াতে বাস করবে না। একদিন তোমাদের মরতে হবে। আবার আখেরাতে পুনরায় জীবিত হয়ে আল্লাহর কাছে এ দুনিয়ার সব কাজ-কর্মের হিসেব দিতে হবে। সুতরাং সেদিকেই বেশী করে মনোযোগ দাও। আর সে জন্যই চেষ্টা সাধনা করো। এসব কথা বলে হযরত সালেহ (আ) তদের এক আল্লাহর দাসত্ব করার আহবান জানালেন। আর অন্য সব কিছু পরিত্যাগ করতে বললেন।

সমাজের লোকেরা তাকে প্রত্যাখান করলো

হযরত সালেহ (আ)-এর এই কথা কওমের নেতাদের পছন্দ হলো না। তারা মনে করলো একথা মানলে তারা আর নেতা থাকতে পারবে না। কওমের লোকদের ওপর এখন যেভাবে হুকুম চালাচ্ছে সেভাবে হুকুম চালাতে পারবে না। তাদের ওপর জুলুম করা যাবে না। সস্তায় তাদের নিকট থেকে কোন কাজ আদায় করা যাবে না। কারণ তখন সবাইকে আল্লাহর কথা মত চলতে হবে। আর আল্লাহর কথা তো ন্যায় বিচারে ভরা। সে কথা মানলে জুলুম বা অন্যায় করা যাবে না। তাই সমাজের নেতারা তাঁর কথা মানলো না। তবে কিছু দুর্বল ও অসহায় লোক তাঁর কথা মেনে নিল। তাঁরা আল্লাহকে বিশ্বাস করলো এবং হযরত সালেহ (আ)-কেও নবী বলে স্বীকার করলো। কিন্তু নেতারা বললোঃ তোমরা যা বিশ্বাস করেছো আমরা তা মানি না।'

কিন্তু আল্লাহর নবীগণ কখনো কোন কিছুতে দমে যান না বা হতাশ হন না। হযরত সালেহ (আ)ও কওমের নেতাদের কথায় দমলেন না। তিনি রাতদিন এক করে আল্লাহর দীনের কথা প্রচার করে চললেন। এতে ফলও ফলতে লাগলো। অল্প সংখ্যক হলেও কিছু কিছু লোক তাঁর কথা মেনে নিতে লাগলো। তবে তারা সমাজের প্রভাবশালী কোন লোক নয়। বরং যারা দুর্বল ও অত্যাচারিত তারাই বেশী সংখ্যায় তাঁর কথা মানতে থাকলো। এ অবস্থা দেখে নেতারা মনে করলো এ ভাবে আর চলতে দেয়া ঠিক নয়। একটা ফন্দি করে সালেহ (আ) এর কাজ বন্ধ করতে হবে। তাই তারা এসে হযরত সালেহ (আ)-কে বললো, তুমি যে আল্লাহর নবী তার প্রমাণ কি? আমাদের সামনে যদি তেমন কোন প্রমাণ পেশ করতে পার তাহলে তোমার কথা বিশ্বাস করা যায় কিনা ভেবে-চিন্তে দেখা যাবে।

হযরত সালেহ (আ) এর মু'জিযা

কওমের নেতাদের এসব কথা শুনে হযরত সালেহ (আ) আল্লাহর কাছে একটা মু'জিযা অর্থাৎ প্রমাণের জন্য দোয়া করলেন। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করলেন। সবাই দেখতে পেল পাহাড় থেকে একটি উটনী নেমে আসছে। উটনীটা কাছে এলে হযরত সালেহ (আ) সেটি দেখিয়ে বললেনঃ দেখো, এই উটনীটাই আমার নবুওয়াতের প্রামাণ। এখন থেকে এ উটনীটা সর্বত্র চরে বেড়াবে। আর তোমাদের এলাকায় যত পানি আছে তার সবটুকু একদিন এ উটনীটা পান করবে। আর অন্যদিন পান করতে পারবে তোমরা ও তোমাদের যত গবাদি পশু আছে সবাই মিলে। এখন থেকে পালা করে এ নিয়ম চলতে থাকবে। এতে তোমাদের কিছু অসুবিধা নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু সাবধান! এ উটনীর কোন ক্ষতি করার চিন্তা করো না। যদি তা করো তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব এসে তোমাদের ধ্বংস করে দেবে।

উটনীটাকে হত্যা করা হলো

প্রথম প্রথম কওমের লোকেরা উটনীটাকে কিছু বললো না। কিন্তু পরে তারা খুবই বিরক্ত হয়ে উঠলো। কারণ উটনীটা যেখানে ইচ্ছা চরে বেড়াতে থাকলো। আর এক দিন পর পর এলাকার সব পানি পান করে ফেলতে লাগলো। এতে সবাই বেশ একটু অসুবিধায় পড়ে গেল। তাদের মধ্যে নয়জন খুব প্রভাবশালী নেতা ছিল। তারা সলা-পরামর্শ করে উটনীটাকে হত্যা করতে মনস্থ

করলো। সুতরাং একজন লোক ঠিক করে তার উপর এ দায়িত্ব দেয়া হলো। অবশেষে যা হবার তাই হলো। সেই দুষ্ট লোকটি একদিন উটনীটাকে হত্যা করে ফেললো। উটনীটাকে হত্যা করার পরে হযরত সালেহ (আ) তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে আর রক্ষা নেই। মাত্র তিনদিনের মধ্যে তোমাদের ওপর আল্লাহর আযাব নেমে আসবে। এর মধ্যে একদিন তারা সালেহ (আ)-কেও রাতের বেলা গোপনে হত্যা করতে মনস্থ করলো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের সে সুযোগ দিলেন না।

আযাব

আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব অবধারিত জেনে হযরত সালেহ (আ) আল্লাহর নির্দেশে সেখান থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তবে যাওয়ার আগেও তিনি বললেনঃ হে আমার জাতির লোকেরা, আমি আল্লাহর হুকুম তোমাদের শুনিয়েছি। আমি তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি। তোমাদের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সে জন্য আমি তোমাদেরকে অনেক বুঝিয়েছি। কিন্তু তোমরা আমার কথা শোননি। প্রকৃত কথা হলো তোমরা তোমাদের মঙ্গলকামীকে পছন্দ করো না। এ কথা বলে হযরত সালেহ (আ) এলাকা ছেড়ে চলে গেলেন। নির্দিষ্ট দিনে বিকট এক আওয়াজ হলো। এত জোরে আওয়াজ হলো যে, এরূপ আওয়াজ আর কোন দিন কেউ শোনেনি। প্রচন্ড আওয়াজে সবাই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। অনেকে মারা গেল। এরপর তাদের ওপর পাথর বর্ষিত হলো। সব শেষে ভূমিকম্প দিয়ে গোটা এলাকা ওলট পালট করে দেয়া হলো। এভাবে সবাই করুণ অবস্থায় মারা গেল।

এ আযাব থেকে হযরত সালেহ (আ) ও তাঁর প্রতি যে একশ বিশজন লোক ঈমান এনেছিলেন তাঁরা বেঁচে গেলেন। পরে তিনি এসব লোকদের নিয়ে ফিলিস্তিনের 'রামলা' নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেছিলেন বলে জানা যায়। এখানে তিনি আল্লাহর দীনের কাজ করতে করতে ইনতিকাল করেন।

জীবনে একটি মুহূর্তের জন্যও তিনি মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতে ভুলে যাননি।

অনুশীলনী

১। আল-হিজর বা মাদায়েনে সালেহ কোথায় অবস্থিত?
২। সামুদ জাতি কারা? তারা কিভাবে ঘর-বাড়ি তৈরী করতো?
৩। সামূদ জাতি কিসের পূজা করত? তাদের কাছে নবী বানিয়ে কাকে পাঠানো হয়েছিল?
৪। হযরত সালেহ (আ) নবুওয়াত লাভ করে কি দেখতে পেলেন? তিনি তাদের কি করতে বললেন?
৫। সামূদ কওমের নেতারা হযরত সালেহ (আ)-এর কথা পছন্দ করলো না কেন?
৬। কি ধরনের লোকজন হযরত সালেহ (আ)-কে নবী বলে মানলো?
৭। উটনীটা কিসের প্রমাণ ছিল? সেটিকে তারা হত্যা করলো কেন?
৮। উটনীটাকে হত্যা করার কয়দিন পর আযাব এসেছিল?
৯। কি কি আযাব দিয়ে সামূদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিল?
১০। কারা এই আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন? তারা পরে কোথায় গেলেন?

হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমাস সালাম

হযরত নূহের (আ) ইনতিকালের বহুদিন পর আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে নবী করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ইরাকের 'উর' নামক এক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল আযর। সে ছিল একজন প্রভাবশালী রাজ পুরোহিত। হযরত ইবরাহীম (আ) যে দেশে জন্মলাভ করেন সে দেশের শাসকের নাম ছিল নমরূদ। সে ছিল খুব অত্যাচারী। সে নিজের ইচ্ছা মত রাজ্য শাসন করতো। তার রাজ্যও ছিল অনেক বড়। রাজ্যের লোকেরা ছিল মুশরিক। তারা নমরূদকে পূজা করতো।

হযরত ইবরাহীম (আ) যখন বড় হলেন তখন দেখলেন লোকেরা মূর্তি পূজা করে। মূর্তির সামনে নত হয়। মূর্তিদের ভয় করে, ভক্তি করে। নমরূদেরও ভাল-মন্দ আদেশ সব তারা মেনে নেয়। এসব দেখে হযরত ইবরাহীম (আ) মনে বড় দুঃখ পেলেন। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন কেমন করে এসব অজ্ঞ লোকদের তিনি বুঝাবেন।

এ অবস্থার মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ) বড় হয়ে উঠলে আল্লাহ তাঁকে নবুওয়াত দান করলেন। তখন তিনি নিজ জাতিকে সংশোধনের পথ পেলেন। তিনি তাঁর পিতাকে বললেনঃ হে আমার সম্মানিত পিতা, আপনি এসব মূর্তি তৈরী করে পূজা করছেন কেন? এসব মূর্তি তো শুনতেও পায় না, দেখতেও পায় না। এদের কোন শক্তি নেই। এরা মানুষের ভাল-মন্দ কিছুই করতে পারে না। হে আমার পিতা, মহান আল্লাহ আমাকে এমন জ্ঞান দান করেছেন যা মানলে আপনি হিদায়াতের পথ পাবেন।' কিন্তু হযরত ইবরাহীমের (আ) পিতা তাঁর কথা তো শুনলোই না, বরং উল্টা তাঁকে কঠোরভাবে এ বলে শাসালোঃ ইবরাহীম, তুমি যদি এসব কথা বলা না ছাড় তাহলে আমরা তোমাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করবো। সুতরাং যদি বাঁচতে চাও তাহলে এসব কথা ছাড়। তা না হলে আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও।

হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর কওমের লোকদের আল্লাহর পথের দিকে ডাকলেন। তিনি তাদের বুঝালেন, সবকিছু ছেড়ে একমাত্র আল্লাহকে রব ও ইলাহ বলে স্বীকার করো। মূর্তি পূজা ছেড়ে দাও। মূর্তির কোন ক্ষমতা নেই। কিন্তু কওমের লোকেরাও তাঁর কথা শুনলো না। তাদের বিশ্বাস মূর্তিগুলোর অনেক ক্ষমতা আছে। হযরত ইবরাহীম (আ) তাদের এ ভুল ভেঙে দেয়ার জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকলেন। একদিন তিনি সুযোগ পেয়েও গেলেন। কোন এক উৎসব উপলক্ষে সব লোক শহরের বাইরে চলে গেল। যাওয়ার সময় তারা হযরত ইবরাহীম (আ)-কেও ডাকলো। কিন্তু তিনি তাদের সাথে না গিয়ে শহরেই থাকলেন। সব লোক চলে যাওয়ার পর তিনি মন্দিরে প্রবেশ করলেন। সেখানে ছোট, বড় ও মাঝারি সব রকমের মূর্তি সারি সারি রাখা ছিল। তিনি একখানা কুঠারের আঘাতে সবগুলো মূর্তি ভেঙে ফেললেন। শুধু বড় মূর্তিটা না ভেঙে তার গলায় কুঠার ঝুলিয়ে রেখে মন্দির থেকে বের হয়ে এলেন।

উৎসব শেষে লোকজন শহরে ফিরে এসে মন্দিরে প্রবেশ করে তাদের সব মূর্তি ভাঙা দেখে হৈ চৈ শুরু করে দিল। তাদের একটিই প্রশ্ন, কে এ কাজ করলো? কেউ কেউ বললো, ইবরাহীম নামে এক যুবক আছে। সে মূর্তি এবং তাদের পূজা করা পছন্দ করে না। সে হয়তো এ কাজ করেছে। সবাই হযরত ইবরাহীম (আ)-কে ডেকে এনে মূর্তি ভাঙার কথা জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেনঃ বড় মূর্তিটাকে জিজ্ঞেস করে দেখ না। ঐ তো কুড়াল ঘাড়ে করে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই বললোঃ তুমি তো জানো মূর্তি কথা বলতে পারে না। সে কি করে বলবে? হযরত ইবরাহীম (আ) বললেনঃ যারা কথা বলতে পারে না, নিজেকে বাঁচাতে পারে না, তোমরা তদের পূজা কর কেন? এবার সবাই লা-জওয়াব হয়ে গেল। কিন্তু সবাই বুঝে ফেললো যে, এ কাজ ইবরাহীমই করেছে।

আস্তে আস্তে কথাটি রাজ দরবার পর্যন্ত পৌঁছলো। বিচারে ইবরাহীমকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করার সিদ্ধান্ত হলো। অনেক কাঠ-খড় যোগাড় করে বিরাট আগুনের কুন্ড জ্বালানো হলো এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-কে তার মধ্যে ফেলে দেয়া হলো। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি আগুনে পুড়লেন না। আল্লাহ্ তাঁর অসীম কুদরতে তাঁকে রক্ষা করলেন। সবাই অবাক হয়ে গেলো।

এরপর একদিন তাঁকে নমরূদের রাজ দরবারে ডাকা হলো। তিনি রাজ দরবারে উপস্থিত হলে নমরূদ তাঁকে জিজ্ঞেস করলোঃ তুমি কাকে রব বা প্রভু বলে স্বীকার করো? হযরত ইবরাহীম (আ) নমরূদের রাজ দরবারে উপস্থিত হয়েও নমরূদকে দেখে ভয় করলেন না। তিনি নমরূদের মুখের ওপর বলে দিলেনঃ আমার প্রভু তিনি যিনি বাঁচাতে ও মারতে পারেন। নমরূদ তখন জেলখানা থেকে দু'জন কয়েদীকে ডেকে এনে একজনকে মেরে ফেললো এবং এজনকে ছেড়ে দিল। সে এবার হযরত ইবরাহীমের দিকে তাকিয়ে বললোঃ দেখলে, আমি মারতেও পারি, বাঁচাতেও পারি? হযরত ইবরাহীম (আ) বললেনঃ ঠিক আছে, আমার প্রভু আল্লাহ্ সূর্য পূর্বদিক থেকে উদিত করেন। তুমি তা পশ্চিম দিক থেকে উঠাও। এবার নমরূদ বোকা বনে গেল। কোন জবাব দিতে পারলো না। হযরত ইবরাহীম (আ) নমরূদের রাজ দরবার থেকে চলে এলেন।

এরপরও তারা হযরত ইবরাহীমের (আ) ওপর নানা ভাবে অত্যাচার করতে থাকলো। তাই তিনি নিজের জন্মস্থান ইরাকের 'উর' শহর ছেড়ে প্রথমে শামদেশে (বর্তমান সিরিয়া) এবং পরে ফিলিস্তিনে হিজরত করলেন। সাথে গেলেন তাঁর স্ত্রী সারা ও ভাতিজা হযরত লূত আলাইহিস সালাম। সেখানে কিছুকাল থাকার পর তিনি স্ত্রী সারাকে নিয়ে মিসর সফরে গেলেন। সেখানকার বাদশাহ তাঁর চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে হাজেরা নাম্নী নিজের বংশের একজন মেয়েকে তাঁর সাথে বিয়ে দিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) আবার ফিলিস্তিনে ফিরে এসে সেখানেই বসবাস করতে শুরু করলেন। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বয়স তখন নব্বই বছরেরও বেশী। তখনও তাঁর কোন সন্ত ানাদি হয়নি। কারণ তাঁর প্রথমা স্ত্রী সারা ছিলেন সন্তানহীনা।

এ সময়ে দ্বিতীয় স্ত্রী হাজেরার গর্ভে হযরত ইবরাহীম (আ)এর একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। তিনি তার নাম রাখলেন ইসমাঈল, এ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার কিছুদিন পরেই আল্লাহ তা'আলা এ পুত্র ও তাঁর মা হাজেরাকে মক্কায় রেখে আসার আদেশ করলেন। তখন পর্যন্ত মক্কা ছিল জন-মানবহীন। সেখানে কেউ বসবাস করতো না। খাদ্য দ্রব্য বা পানিও সেখানে পাওয়া যেত না। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ) এসব কোন কিছুই চিন্তা করলেন না। তিনি তার স্ত্রী ও পুত্রকে মক্কায় রেখে এলেন। আল্লাহর অশেষ করুনায় সেখানে যমযম নামক কুপের উদ্ভব হলো। এ কুপের পানি পাওয়ার পরে লোকজন সেখানে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করলো। এভাবে মক্কায় মানুষের বসতি গড়ে উঠলো।

হযরত ইবরাহীম (আ) বাস করতেন শত শত মাইল দূরে ফিলিস্তিনে। তিনি মাঝে মাঝে স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ইসমাঈলকে দেখতে মক্কায় আসতেন। পুত্র ইসমাঈল কিছু বড় হলে একদিন তিনি স্বপ্নে দেখলেন আল্লাহ তা'আলা তাঁর পুত্রকে কুরবানী করতে আদেশ করছেন। নবীদের স্বপ্ন কখনো মিথ্যা হয় না। তাই তিনি পুত্র ইসমাঈলকে সব কিছু খুলে বললেন। পুত্রও খুশী মনে কুরবানী হতে রাজী হয়ে গেলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁকে নিয়ে মক্কার অদূরে মিনা উপত্যকায় উপস্থিত হলেন। বৃদ্ধ পিতার আদরের ধন একমাত্র পুত্র ইসমাঈলকে কোরবানীর উদ্দেশ্যে শুইয়ে দিয়ে আল্লাহকে খুশী করার জন্য পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) চোখ বন্ধ করে তাঁর গলায় ছুরি চালালেন। পরীক্ষায় তিনি পাশ করলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর ছুরির নিচে থেকে ইসমাঈলকে সরিয়ে দিলেন এবং তাঁর পরিবর্তে একটি দুম্বা ছুরির নিচে দিয়ে ইবরাহীমকে ডেকে বললেনঃ হে ইবরাহীম, তুমি স্বপ্নের মাধ্যমে দেয়া আমার আদেশ সত্যই পালন করে দেখালে। তাই আমি তোমার জন্য এ ব্যবস্থা করলাম।

পিতা পুত্র বাড়িতে ফিরে এলেন। কিছু দিন পরে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বায়তুল্লাহর স্থান দেখিয়ে তা নির্মাণ করতে আদেশ করলেন। তাই পিতা-পুত্র উভয়ে মিলে এবার কা'বা ঘর বা বায়তুল্লাহ তৈরী করতে থাকলেন। পাথর বহন করে এনে তা ঠিকঠাক মত ছেঁটে কেটে একটার পর একটা রেখে নির্মাণ কাজ চললো। হযরত ইসমাঈল (আ) পাথর ও অন্যান্য জিনিস যোগান দিচ্ছিলেন আর হযরত ইবরাহীম (আ) ঘরের দেয়াল গেঁথে উঠাচ্ছিলেন। এ সময় বাপ-বেটা উভয়ে অত্যন্ত আকুলভাবে দো'আ করেছিলেনঃ 'হে আল্লাহ, আমাদের এ কাজ কবুল কর।'

এভাবে সারাজীবন একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহর দীনের কাজ করে মানুষকে আল্লাহর পথে ডেকে একশত পঁচাত্তর বছর বয়সে হযরত ইবরাহীম (আ) ইনতিকাল করেন। ফিলিস্তিনের আল-খলীল নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। প্রথমা স্ত্রী সারার গর্ভেও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও নবী ছিলেন। তার নাম হযরত ইসহাক (আ)। হযরত

ইসমাঈল (আ) একশ' সাইত্রিশ বছর বয়সে মক্কায় ইনতিকাল করেন। তাঁকে বায়তুল্লাহর নিকটে তাঁর মায়ের কবরের পাশেই দাফন করা হয়।

আল্লাহর নবীগণ এভাবেই সারা জীবন আল্লাহর নির্দেশ পালন করেছেন এবং মানুষকে সত্যের পথে ডেকেছেন।

অনুশীলনী

১। হযরত ইবরাহীম (আ) কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন? তাঁর পিতার নাম কি ছিল?

২। হযরত ইবরাহীম (আ) বড় হয়ে কি দেখলেন?

৩। হযরত ইবরাহীম (আ) মূর্তিদের সম্বন্ধে পিতার কাছে কি বললেন?

৪। উৎসবের দিন সব লোক শহরের বাইরে চলে গেলে হযরত ইবরাহীম (আ) কি করলেন?

৫। উৎসব শেষে লোকেরা ফিরে এসে কি দেখলো?

৬। মূর্তি ভাঙার কথা জিজ্ঞেস করলে হযরত ইবরাহীম (আ) কি বললেন?

৭। হযরত ইবরাহীম (আ)-কে আগুনে ফেলার পর কি হলো?

৮। নমরূদের প্রশ্নের জবাবে হযরত ইবরাহীম (আ) কি বলেছিলেন?

৯। তিনি জন্মস্থান ছাড়লেন কেন? জন্মস্থান ছেড়ে তিনি কোথায় গেলেন?

১০। ইসমাঈল কার গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন?

১১। কে কে কা'বা ঘর নির্মাণ করলেন?

হযরত লূত আলইহিস সালাম

হযরত লূত আলাইহিস সালাম ছিলেন আল্লাহর একজন নবী। তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীমের (আ) ভাতিজা। তাঁর পিতার নাম ছিল হারাণ। হযরত ইবরাহীম (আ) ইরাকের প্রাচীন ব্যাবিলন শহরের নিকটবর্তী 'উর' নামক যে স্থানে জন্মলাভ করেছিলেন হযরত লূতও (আ) সেখানেই জন্মলাভ করেন।

আল্লাহর পথে অর্থাৎ ইসলামের দিকে মানুষকে ডাকতে গিয়ে হযরত ইবরাহীম (আ) নমরূদ ও তাঁর দেশের অন্যান্য লোকদের হাতে জুলুম নির্যাতন ভোগ করলেন, তাদেরকে অনেক বুঝালেন কিন্তু তারা তাঁকে আল্লাহর নবী বলে বিশ্বাস করলো না। বরং তাঁর প্রতি আরো মারমুখী হয়ে উঠলো। এ অবস্থা দেখে হযরত ইবরাহীম (আ) তাদের ঈমান গ্রহণ সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন এসব লোক তাঁকে নবী বলে বিশ্বাস করবে না। আর আল্লাহকেও প্রভু বলে স্বীকার করে তাঁর হুকুম আহকাম মেনে চলবে না। তাই তিনি ইরাক ছেড়ে অন্য দেশে চলে যাওয়ার সংকল্প করলেন। তিনি মনে করলেন এ এলাকা ছেড়ে অন্য স্থানে গেলে সেখানকার লোকের মধ্যে আল্লাহর হুকুম-আহকাম ঠিক মত প্রচার করতে পারবেন। লোকদের আল্লাহর পথে ডাকতেও পারবেন। তাই তিনি ইরাক ছেড়ে ফিলিস্তিনে হিজরত করলেন।

হিজরত করার সময় হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে আরো দু'জন লোক হিজরত করলেন। তাঁদের একজন ছিলেন হযরত ইবরাহীমের (আ) স্ত্রী সারা এবং অন্যজন ছিলেন তাঁর ভাতিজা হযরত লূত আলাইহিস সালাম। এ দু'জনই হযরত ইবরাহীম (আ)-কে আল্লাহর নবী বলে বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর নির্দেশ মত চলতেন। হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর স্ত্রী সারা ও ভাতিজা লূতকে সাথে করে হিজরত করলেন। প্রথমে তাঁরা ফিলিস্তিনে পৌঁছলেন এবং পরে মিসর চলে গেলেন।

মিসর থেকে ফিরে এসে হযরত ইবরাহীম (আ) ভাতিজা লূতকে বর্তমান জর্ডান রাষ্ট্রের অন্তর্গত মরু- সাগরের দক্ষিণে সাদুম নামক এলাকায় সেখানকার লোকদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য পাঠালেন। হযরত লূত (আ) এস্থানেই বসতি স্থাপন করলেন আর মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতে থাকলেন।

সাদূমের অধিবাসীরা ছিল খুবই খারাপ প্রকৃতির লোক। হযরত লূত (আ) দেখলেন সাদূমের অধিবাসীরা সবাই খুব জঘণ্য ধরণের কাজে লিপ্ত। যে কোন খারাপ ও লজ্জার কাজ করতে তারা মোটেই কুণ্ঠা বোধ করতো না। এমন কোন লজ্জার কাজ ছিল না যা তারা করতে পারতো না। যে কোন লজ্জাকর কাজ তারা মাহফিলে বসে করতো। তাদের এলাকায় কোন বিদেশী লোক বা কাফেলা এলে দিন-দুপুরে তারা তার সব কিছু লুট পাঠ করে নিতো। রাস্তার পাশে ওঁত পেতে

বসে থেকে ডাকাতি করতো। এ ছাড়াও আরো এমন অনেক কাজ করতো যা মুখে বলতেও লজ্জা লাগে। তোমরা বড় হলে তাদের ওই সব গোনাহর কাজ সম্পর্কে আরো জানতে পারবে।

তোমরা জানো, নবী এবং রসূলগণ যেখানেই যান বা থাকেন সেখানকার লোকজনকে ভাল হতে উপদেশ দেন, ভাল কাজ করতে বলেন, আর সব রকম অন্যায় কাজ ছেড়ে দিতে বলেন। তাঁরা চান সব মানুষ আল্লাহর হুকুম মত চলুক যাতে সমাজের বুকে ও রাষ্ট্রের মধ্যে সবাই শান্তিতে বাস করতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর অনেক মানুষ না বুঝে বোকার মত তাঁদের বিরোধিতা করে।

হযরত লূত (আ) দেখলেন সাদূম ও তার পার্শ্ববর্তী আমুরা শহরের লোকেরা আল্লাহকে ভুলে গিয়ে সব রকম অন্যায় কাজ করছে। তিনি তাদের বললেনঃ আমি আল্লাহর নবী। তোমরা যে সব কাজ করছো তা অন্যায়। আল্লাহ্ এসব কাজ পছন্দ করেন না। তোমরা এসব কাজ ছেড়ে দাও। এক আল্লাহকে প্রভু বলে মেনে নাও এবং তাঁর আদেশ মত চলো। কিন্তু সাদূম ও আমুরার লোকেরা তাঁর কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করলো না। বরং ঠাট্টা বিদ্রুপ করে পরস্পর বললো, এত বড় ভাল লোক দিয়ে আমাদের কোন কাজ নেই। তাঁকে এবং তাঁর সংগী-সাথীদের এলাকা থেকে তাড়িয়ে দাও।

এরূপ ব্যবহার দেখে হযরত লূত (আ) শেষ বারের মত তাদের সাবধান করতে চাইলেন। তাই তিনি একটি মাহফিলে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন! আমি দেখছি তোমরা জঘণ্য বেহায়াপনার কাজ করছো। রাহাজানি করে বেড়াচ্ছো। প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে অশ্লীল কাজ করছো। এ ছাড়াও তোমরা অনেক গোনাহর কাজে লিপ্ত রয়েছো। আমি আল্লাহর নবী হিসেবে তোমাদেরকে শেষ বারের মত সাবধান করছি। যদি তোমরা এসব করা ছেড়ে না দাও তাহলে আল্লাহ তা'আলা আযাব নাযিল করে তোমাদের ধ্বংস করে ফেলবেন।

এ কথা শুনে তাঁর কওমের লোকজন আরো বেঁকে বসলো। তারা জিদ ধরে বললোঃ ঠিক আছে, এমন কাজ করলে যদি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এবং আযাব পাঠান তাহলে তুমি আমাদের জন্য সে আযাব নিয়ে এসো। এভাবে তারা আল্লাহর নবীর কথা শুনলো না। আর তাই আল্লাহ আযাব পাঠিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করার কথা তাঁর নবীকে জানিয়ে দিলেন।

একদিন মানুষের রূপ ধরে তিনজন ফেরেশতা হযরত লূত আলাইহিস সালামের বাড়িতে এলেন। তাঁরা হযরত লূতকে বললেনঃ আজকের রাত্রি ভোর হওয়ার আগেই আপনি ঈমানদারদের সাথে নিয়ে এ এলাকা ছেড়ে চলে যাবেন। আমরা আল্লাহর ফেরেশতা। এ এলাকার মানুষকে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। ভোর হওয়ার আগেই আমরা এসব পাপী লোকদের ধ্বংস করবো। তাই আপনি কোন দিকে খেয়াল না করে দ্রুত এ এলাকা ছেড়ে যান।

এত দিনের প্রচারের ফলে যেসব লোক হযরত লূতের (আ) প্রতি ঈমান এনেছিল তিনি তাদেরকে সাথে নিয়ে সাদূম থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ভোর হওয়ার আগেই তিনি এলাকর বাইরে চলে

গেলেন। এদিকে ভোরের আলো প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই ফেরেশতাগণ গোটা এলাকা ওলট পালট করে দিলেন। সব লোক মাটি চাপা পড়ে মারা গেল। এরপর তাদের ওপর আসমান থেকে ভারী পাথর বর্ষণ করা হলো। গোটা এলাকায় নেমে এলো চিরদিনের জন্য নিস্তব্ধতা। আজ পর্যন্ত আর ঐ এলাকায় মানুষের কোন বসতি গড়ে উঠতে পারেনি। ধীরে ধীরে ঐ এলাকা মরু সাগরের পানিতে ডুবে গিয়ে সাগরে পরিণত হয়েছে।

সাদূম থেকে বেরিয়ে হযরত লূত (আ) তাঁর ঈমানদার সাথীদের নিয়ে 'দাগার' নামক পাশ্ববর্তী একটা স্থানে চলে গেলেন। ভোর হলে তিনি দেখলেন, সাদূম ও আমুরা এলাকা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। পরে তিনি ঐ এলাকা ছেড়ে পার্শ্ববর্তী অন্য একটি এলাকায় বসতি স্থাপন করেন এবং সারা জীবন আল্লাহর দীনের দিকে মানুষকে আহবান জানাতে থাকেন। এ স্থানেই তিনি ইনতিকাল করেন।

নবী রসূলগণ মানুষের দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারেন না। হযরত লূতও (আ) তাঁর লোকদের উপদেশ দিয়েছেন এবং ভাল পথে ডেকেছেন। কিন্তু তাঁর কথা না শোনার কারণেই সাদূম ও আমূরার অধিবাসীরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তাই সবার উচিত আল্লাহর নবীর কথা মেনে চলা।

অনুশীলনী

১। হযরত লূতের (আ) পিতার নাম বল। হযরত ইবরাহীমের (আ) সাথে তাঁর সম্পর্ক কি?

২। হযরত লূত (আ) কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

৩। হযরত ইবরাহীমের (আ) সাথে কয়জন হিজরত করেছিলেন? তাঁদের নাম বল।

৪। হিজরত করে প্রথমে তাঁরা কোথায় গেলেন?

৫। হযরত লূত (আ) কোথায় বসতি স্থাপন করলেন? সে এলাকার লোক কেমন ছিল?

৬। হযরত লূত (আ) সাদূমবাসীদের কি বললেন এবং তারা কি বললো?

৭। শেষবারের মত হযরত লূত (আ) তাদেরকে কি বললেন?

৮। শেষ কথা শোনার পর সাদূমবাসীরা কি করলো?

৯। সাদূমবাসীদেরকে আযাব দিয়ে কিভাবে ধ্বংস করা হলো?

১০। ঐ এলাকার অবস্থা পরে কিরূপ হয়েছে?

১১। হযরত লূত (আ) পরে কোথায় গেলেন?

১২। আমাদের কি করা উচিত?

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম মিসরে জন্মলাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন আল্লাহর নবী হযরত ইয়াকুবের (আ) বংশধর। তাঁর পিতার নাম ছিল ইমরান। হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈল বংশের লোক। বনী ইসরাঈলগণ কিনআন থেকে হযরত ইউসুফের (আ) যুগে মিসরে আসেন এবং বসবাস করতে থাকেন। তাঁর সময়েও মিসরের শাসক রাজাদের উপাধি হতো ফিরআউন। হযরত ইউসুফের (আ) সময়ের ফিরআউন হযরত ইউসুফের সুমধুর চরিত্র, জ্ঞান-গরিমা ও বুদ্ধিমত্তা দেখে মুগ্ধ হন এবং মিসরের শানভার তাঁর ওপর অর্পণ করে নিজে নাম মাত্র শাসক থাকেন। এ সময়ে বনী ইসরাঈলগণ কিনআন থেকে মিসরে আগমন করেন।

হযরত মূসা (আ) যে সময় জন্মলাভ করেন সে সময় মিসরের শাসক ছিল ফিরআউন দ্বিতীয় রা'মসীস। এ সময় বিভিন্ন কারণে মিসরের আদি অধিবাসী কিবতিরা বনী ইসরাঈলদের ওপর অত্যাচার শুরু করেছিল। ফিরআউন রা'মসীসের হুকুমে বনী ইসরাঈলদের ঘরে কোন পুত্র সন্তান হলে তাকে সরকারী লোকজন গিয়ে মেরে ফেলতো। আরো বিভিন্ন ভাবে তাদের ওপর অত্যাচার করা হতো। তাদের দিয়ে অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ করানো হতো। এ যখন অবস্থা তখন বনী ইসরাঈলদের মধ্যে মূসা (আ) জন্মলাভ করেন। সরকারী লোকজন খবর পেলেই এসে তাঁকে মেরে ফেলবে, এ চিন্তায় হযরত মূসার মা অস্থির হয়ে উঠলেন। অবশেষে তিনি একটি ফন্দি করলেন। একটি কাঠের বাক্স তৈরী করে তার মধ্যে মূসাকে শুইয়ে দিয়ে বাক্সটি নীল নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। বাক্স ভাসতে ভাসতে ফিআউনের মহলের ঘাটে গিয়ে ভিঁড়লো। লোকজন বাক্সটি তুলে এনে দেখলো তার মধ্যে ফুটফুটে একটি শিশু হাত-পা নেড়ে খেলা করছে। ফিরআউন তাকে কোন বনী ইসরাইল ঘরের সন্তান মনে করে মেরে ফেলতে চাইলো। কিন্তু ফিরআউনের স্ত্রী তাকে নিজের সন্তান হিসেবে লালন-পালন করতে চাইলেন। ফিরাউন এতে রাজি হলো এবং পরে টাকার বিনিময়ে মূসার মাকেই দাই হিসেবে ডেকে আনা হলো। এভাবে আল্লাহর মহান কুদরতে হযরত মূসা (আ) রক্ষা পেলেন এবং নিজের মায়ের কোলেই লালিত পালিত হতে লাগলেন।

ফিরআউনের মহলেই হযরত মূসা (আ) ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠলেন। বড় হয়ে তিনি দেখলেন মিসরে বনী ইসরাঈলদের ওপর চলছে নানা প্রকার জুলুম। মাঝে মাঝে তিনি এ সব জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন। একদিন তিনি বাজারের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন এক কিবতী বনী ইসরাঈলের একজন লোকের ওপর জুলুম করছে। হযরত মূসা (আ) কিবতীকে নিবৃত্ত করতে চাইলেন। কিন্তু সে হযরত মূসা (আ)-কেই আক্রমণ করে বসলো। তখন তিনি কিবতীকে সজোরে এক ঘুষি লাগালেন। এতে হঠাৎ করে সে মারা গেল। পরে মূসা (আ)

জানতে পারলেন ফিরআউন বিষয়টি জানতে পেরেছে এবং তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে। এ খবর পেয়ে হযরত মূসা (আ) মিসর ছেড়ে বের হলেন এবং কয়েক দিন পর মাদায়েন এলাকায় গিয়ে উপস্থিত হলেন।

বেশ কয়েক বছর তিনি মাদায়েনে কাটালেন এবং সেখানেই বিয়ে করলেন। পরে ক্ষমতাসীন ফিরআউন দ্বিতীয় রামসীসের মৃত্যু হলে এবং তার পুত্র মিনফাতাহ ফিরআউন হলে তিনি মাদায়েন থেকে মিসরে ফিরে যেতে মনস্থ করলেন। তাই একদিন স্ত্রীকে সাথে নিয়ে মিসরে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে সিনাই মরুভূমিতে একদিন রাত্রি বেলা আগুনের দরকার হলো। হযরত মূসা (আ) পাহাড়ের উপর আগুন দেখে তা আনতে গেলেন। পাহাড়টির নাম ছিল তূর পাহাড়। আর আগুন ছিল মহান আল্লাহর নূর। সেখানেই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুওয়াত দান করলেন। আল্লাহ তাঁকে আদেশ করলেন: তুমি ফিরআউনের কাছে যাও। সে বাড়াবাড়ি করছে। তাকে আমার আদেশ নিষেধ শুনিয়ে সৎপথে আসতে বলো। এই সাথে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে কিছু মুজিযাও দান করলেন।

মূসা (আ) মিসরে গিয়ে ফিরআউনের দরবারে উপস্থিত হলেন। সংগে ছিলেন তাঁর ভাই আল্লাহর নবী হযরত হারুন (আ)। দরবারে উপস্থিত হয়ে মূসা (আ) ফিরআউনকে বললেনঃ আমাদের দু' ভাইকে আল্লাহ তাঁর রসূল করে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। আমরা তোমার কাছে আল্লাহর দেয়া হিদায়াতের বাণী নিয়ে এসেছি। তুমি আল্লাহকে প্রভু বলে স্বীকার করো। তাঁর আইন-কানুন দেশে চালু করো। তাহলে দেশে সুখ-শান্তি আসবে। আর বনী ইসরাঈলদের ওপর অত্যাচার করা বন্ধ করো। তা না হলে তাদের মিসর থেকে বের করে নিয়ে যেতে দাও।

এসব কথা শুনে ফিরআউন বললোঃ হে মূসা, তোমার রব বা প্রভু কে? মূসা (আ) বললেনঃ যিনি আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত, জীব-জন্তু সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। যিনি সবাইকে খেতে দেন, যিনি মৃত্যু দেন তিনিই আমার রব বা প্রভু। ফিরআউন বললোঃ তুমি যে আল্লাহর নবী তার প্রমাণ কি? তখন মূসা (আ) তাঁর লাঠিখানা মাটিতে ফেলে দিলেন। সংগে সংগে সেটি সাপ হয়ে গেল। আর হাতখানা বগলের নিচে রেখে তারপর বাইরে বের করলেন, আর সংগে সংগে তা বিদ্যুতের চমক সৃষ্টি করলো। এসব দেখে ফিরআউন মনে করলো মূসা খুব যাদুবিদ্যা শিখে এসেছে। সুতরাং তাঁকে বড় বড় যাদুকর দিয়ে জব্দ করতে হবে। তাই ফিরআউন সারা মিসরের সব বড় বড় যাদুকরকে ডেকে মূসা (আ)-কে মোকাবিলা করতে বললো। একদিন একটা মাঠে অসংখ্য লোকের সামনে হযরত মূসা (আ) ও যাদুকরদের মোকাবিলা হলো। যাদুকররা তাদের যাদুর সাহায্যে বড় বড় সাপ তৈরী করলো এতে ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হলো। কিন্তু হযরত মূসা (আ) ভয় পেলেন না। তিনি তাঁর লাঠি মাটিতে ফেলা মাত্র তা প্রকান্ড সাপে পরিণত হলো এবং যাদুকরদের বানানো সাপগুলোকে এক এক করে মুহূর্তের মধ্যে গিলে ফেললো। এতে যাদুকররা

বুঝতে পারলো যে মূসা (আ) যাদুকর নন। তিনি সত্যই আল্লাহর নবী। সুতরাং যাদুকররা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো এবং হযরত মূসা (আ)-কে নবী বলে স্বীকার করে নিল। আরো অনেক লোকও ঈমান আনলো। এ দেখে ফিরআউন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। শুরু হলো মূসা (আ) ও তাঁর লোকদের ওপর আরো বেশী অত্যাচার। সব দেখে মূসা (আ) তাঁর লোকদের বললেন, সবর করো- ধৈর্য ধরো। তোমরা সত্য পথে আছ। সুতরাং তোমরাই জয়ী হবে।

জুলুম, অত্যাচার খুব বেড়ে গেল। যে সব যাদুকর আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল এবং মূসা (আ)-কে নবী বলে স্বীকার করেছিল ফিরআউন তাদের শূলে চড়িয়ে হত্যা করলো। মূসা (আ) দেখলেন এখন আর মিসরে থাকা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহর নির্দেশে তিনি মিসর থেকে বনী ইসরাঈলদের নিয়ে অন্য জায়গায় চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এক রাতে যখন মিসরের অধিবাসীরা এবং ফিরআউনের লোকজন এক আনন্দ উৎসবে মত্ত ছিল তখন মূসা (আ) খবর পাঠিয়ে সমস্ত বনী ইসরাঈলদের জড়ো করলেন এবং মিসর থেকে বের হয়ে পড়লেন। তিনি চাচ্ছিলেন লোহিত সাগর পার হয়ে সিনাই উপত্যকায় পৌঁছবেন। বনী ইসরাঈলরা বের হয়ে পড়ার পরপরই ফিরআউন তা জানতে পারলো। সুতরাং তৎক্ষণাৎ সে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করলো। সকাল বেলায় বনী ইসরাঈলরা যখন লোহিত সাগরের কিনারে পৌঁছলো তার পরপরই ফিরআউনের বিশাল সৈন্যদল অস্ত্র-শস্ত্র সহ তাদের কাছে পৌঁছে গেল। বনী ইসরাঈলরা ভয়ে শিউরে উঠলো। কিন্তু আল্লাহর নবী মূসা (আ) মোটেই ভয় পেলেন না। তিনি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলেন। আল্লাহ ত'আলা তাঁকে আদেশ করলেনঃ তুমি তোমার লাঠি দিয়ে সাগরের পানির উপর আঘাত কর। মূসা (আ) তাই করলেন। সংগে সংগে সাগরের পানি দু' ভাগ হয়ে গেল এবং মাঝখান দিয়ে রাস্তা তৈরি হয়ে গেল। মূসা (আ) সে রাস্তা দিয়ে বনী ইসরাঈলদের নিয়ে পার হয়ে সিনাই উপত্যকায় পৌঁছে গেলেন। ফিরআউন দেখলো সাগরের মধ্য দিয়ে সুন্দর রাস্তা। মূসা দিব্যি এ রাস্তা দিয়ে পার হয়ে গেল। সুতরাং সে তার লোকজন সৈন্য-সামন্তকেও সে রাস্তা দিয়ে পার হতে আদেশ দিল। নিজেও অগ্রসর হলো। কিন্তু সাগরের মাঝখানে পৌঁছলে আল্লাহর আদেশে সাগরের পানি আবার মিশে গেল। ফিরআউন ও তার সৈন্য-সামন্ত সাগরের অথৈ পানিতে হাবুডুবু খেতে লাগলো। এভাবে ফিরআউন ও তার লোকজন লোহিত সাগরে ডুবে মারা গেল। জালিমদের পরিণতি কেমন হয় আল্লাহ পাক এভাবে তা দেখিয়ে দিলেন।

হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলদের মিসর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে সিনাই উপদ্বীপে পৌঁছলেন। তূর পাহাড় এই স্থানে অবস্থিত। এ পাহাড়েই আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ) এর সাথে কথা বার্তা বলতেন। মূসা (আ) কে আল্লাহ তা'আলা 'তাওরাত' নামক আসমানী কিতাব দান করলেন- যাতে তিনি তাঁর জাতিকে আল্লাহর পথে চালাতে পারেন। এখানেই মূসার (আ) বড় ভাই

আল্লাহর নবী হযরত হারুন (আ) মৃত্যুবরণ করেন। হযরত মূসাও (আ) দীর্ঘদিন জীবিত থাকার পর এ স্থানেই একশ' বিশ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন এবং তূর পাহাড়ের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। একটি হাদীসে নবী (স) বলেছেনঃ আমি সেখানে গেলে পথের ধারে বালুর লাল ঢিবিগুলো থেকে সামান্য দূরে তাঁর কবর তোমাদের দেখিয়ে দিতে পারতাম।

এভাবেই আল্লাহর সব নবী (আ) মানুষের উপকারের জন্য সারা জীবন কাজ করে গিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেই ভয় করেননি।

অনুশীলনী

১। হযরত মূসা (আ) কোথায় জন্মলাভ করেছিলেন?

২। বনী ইসরাঈলগণ কখন মিসরে গমন করেছিলেন?

৩। একদিন বাজারের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় মূসা (আ) কি দেখলেন? তিনি তখন কি করলেন?

৪। হযরত মূসা (আ) মিসর ছেড়ে গেলেন কেন? তিনি কোথায় গেলেন?

৫। হযরত মূসা (আ) কোন স্থানে নবুওয়াত লাভ করলেন? আল্লাহ তাঁকে কি বললেন?

৬। যাদুকরদের ডেকে ফিরআউন কি করলো? যাদুকররা ঈমান আনলো কেন?

৭। ফিরআউন কিভাবে ডুবে মরলো?

৮। হযরত মূসা (আ) কোথায় ইনতিকাল করেছিলেন? তাঁর বয়স তখন কত ছিল?

৯। মিসরের শাসকদের উপাধি কি ছিল?

১০। হযরত মূসা (আ) এর সময়ে মিসরের শাসক কেমন ছিল? তার নাম কি ছিল?

১১। মূসা (আ) এর ভাইয়ের নাম কি? তিনি কোথায় ইনতিকাল করেন?

১২। মূসা (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা যে মুযিজা দিয়েছিলেন তা কি ছিল উল্লেখ করো।

১৩। হযরত মূসা (আ) এর ওপর নাযিলকৃত কিতাবের নাম কি?

হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম

হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম বনী ইসরাঈল বংশের একজন নবী এবং হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের পুত্র ছিলেন। কোরআন মজীদের বিভিন্ন সূরায় ষোলটি জায়গায় হযরত সুলায়মানের (আ) কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ হযরত দাউদ (আ)-কে নবুওয়াত ও বাদশাহী এক সাথে দান করেছিলেন। হযরত সুলায়মান (আ)-কেও তেমনি নবুওয়াত ও বাদশাহী এক সাথে দান করেছিলেন। তাঁর রাষ্ট্র ছিল যেমন বিশাল তেমনি তিনি ছিলেন অনেক বিস্ময়কর ক্ষমতার অধিকারী এবং বুদ্ধিমান।

হযরত দাউদের (আ) ইনতিকালের পর বার বছর বয়সে হযরত সুলায়মান (আ) পিতার বিশাল রাজ্যের অধিকারী হলেন। বয়স এতো কম হলে কি হবে? তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুব পারদর্শী। তিনি বাল্যকাল থেকেই যে কোন মামলা মোকদ্দমার সঠিক ফয়সালা করতে পারতেন। একবার হযরত দাউদের (আ) কাছে এসে এক ব্যক্তি একটি মামলা দায়ের করলো যে, এক ব্যক্তির বকরীর পাল তার ফসলের ক্ষেতে ঢুকে তা নষ্ট করে ফেলেছে। হযরত দাউদ (আ) বকরীর মালিকের বকরীগুলো ক্ষেতের মালিককে দিয়ে দেয়ার ফয়সালা দিলেন। কিন্তু হযরত সুলায়মান (আ) এই ফয়সালা পছন্দ করলেন না। তিনি ফয়সালা করলেন যে, বকরীর মালিক ক্ষেতের যত্ন নেবে ও দেখা-শোনা করবে। ক্ষেত পূর্বের মত না হওয়া পর্যন্ত বকরীগুলো ক্ষেতের মালিকের কাছে থাকবে এবং ক্ষেতের মালিক বকরীগুলো থেকে উপকৃত হতে পারবে। এ ফয়সালা হযরত দাউদ (আ) ও অন্য সবাই পছন্দ করলেন।

বায়তুল মাকদাসের নির্মাণ

বাদশাহ হিসেবে ক্ষমতা লাভের পর হযরত সুলায়মান (আ) পিতার অসিয়াত অনুসারে বায়তুল মাকদাসের নির্মাণ শুরু করেন। প্রচুর অর্থ ব্যয় করে সাত বছরে তিনি এ মহৎ কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হন। তিনি ইয়ারুসালেম (জেরুজালেম) শহরের চারদিকে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করে শহরকে সুরক্ষিত করেন। বায়তুল মাকদাস নির্মাণ শেষ হওয়ার পর তিনি হাইকালে সুলায়মানী নামক মহল নির্মাণ করেন। এভাবে সংস্কার ও নির্মাণ কাজের প্রতি তিনি খুব গুরুত্ব প্রদান করেন। অনেকে লিখেছেন, হযরত সুলায়মানের (আ) একটা বৃহৎ নৌ-বহর ছিল। এ নৌ-বহরের মাধ্যমে তিনি ভারত থেকে সোনা, রূপা ও অন্যান্য মুল্যবান সামগ্রী নিয়ে যেতেন। তিনি আল্লাহর ও তাঁর ইসলামী রাষ্ট্রের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উত্তম জাতের বহু ঘোড়া পালতেন।

হযরত সুলয়মানের (আ) প্রতি আল্লাহর নিয়ামত

আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মানকে (আ) পশু-পাখীর ভাষা বুঝার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। যেমন হুদহুদ নামক পাখী ও পিঁপড়ার কথা বুঝার বিষয় কোরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বাল্যকাল থেকেই হিকমত বা বুদ্ধিমত্তা দান করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে

বাতাসের ওপরও কর্তৃত্ব দান করেছিলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় পশু-পাখী ও জ্বিন, এমন কি বিদ্রোহী শয়তানদের উপরও আধিপত্য লাভ করেছিলেন। এরা সবাই ছিল তাঁর প্রজা। তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল এদের সবার ওপর। এমন কি তাঁর সৈন্যদলে মানুষ ছাড়া জ্বিন এবং পাখীও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি দুষ্ট ও বিদ্রোহী জ্বিনদের ধরে ধরে শাস্তি দিতেন এবং বন্দী করে রাখতেন। তাদের দিয়ে কঠিন কাজও আদায় করতেন। এ ভাবে তাদের ক্ষতিকর প্রভাব থেকেও মানুষকে রক্ষা করতেন।

সাবার রাণী বিলকিসের ইসলাম গ্রহণ

সুলায়মানের (আ) সময়ে সাবা নামে আরবের সর্ব দক্ষিণে একটি রাজ্য ছিল। রাণী বিলকিস সে দেশ শাসন করতেন। সে দেশের সব মানুষ সূর্যের পূজা করতো। দেশটি ছিল খুবই সুন্দর। হুদহুদ পাখীর মুখে হযরত সুলায়মান (আ) সে দেশের ও রাণীর খবর জানতে পারলেন। তিনি পাখীর মাধ্যমে রাণীকে ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর কাছে হাজির হওয়ার জন্য পত্র পাঠালেন। পাখী পত্র খানা রাণীর কাছে পৌঁছে দিলে রাণী তাঁর সব লোকজনকে ডেকে পরামর্শ করলেন এবং নির্দেশ মত সুলায়মানের (আ) কাছে হাজির হওয়ার জন্য রওয়ানা হলেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তিনি হযরত সুলায়মান (আ) দরবারে হাজির হলেন এবং তাঁর চরিত্র, বুদ্ধিমত্তা, শাসন ক্ষমতা ও জাঁক-জমক দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি সমস্ত দলবলসহ ইসলাম গ্রহণ করলেন। এভাবে হযরত সুলায়মানের (আ) সময়েই সুদূর সাবায় ইসলামের বাণী ছড়িয়ে পড়লো।

হযরত সুলায়মান (আ) শুধু নবী ছিলেন না। তিনি ছিলেন বিশাল এক রাজ্যের বাদশাহও। তাই বলে তিনি বাদশাহীর মোহে পড়ে এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহকে ভূলেননি। আল্লাহর নির্দেশ মতই তিনি রাজকার্য পরিচালনা করতেন, নিজেও সে ভাবে চলতেন। সব ব্যাপারেই তিনি ন্যায় ও ইনসাফ অনুসারে ফয়সালা করতেন। তিনি সামান্য কোন অন্যায় করেছেন একথা বিশ্বাস করা একেবারেই অসম্ভব। তাই বলে ভাল মানুষকেও খারাপ বলার লোকের কিন্তু অভাব হয় না। আল্লাহর লানতপ্রাপ্ত ইয়াহুদীরা তাঁকে নানাভাবে দোষারোপ করেছে। কারণ, তিনি তাদের খারাপ কাজ করতে মানা করতেন।

ইনতিকাল

সাবার রাণী বিলকিসের সাথে হযরত সুলায়মানের বিয়ে হয়ে যায়। রাণী বিলকিসের জন্য তিনি বা'লাবাক শহরে একটি প্রকান্ড মহল নির্মাণ করেছিলেন। তিনি নিজেও এটি দেখাশুনা করছিলেন। এ অবস্থায় তিনি একদিন ইনতিকাল করেন। তখন তিনি লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ইনতিকালের পরেও লাঠির উপর ভর দেয়া অবস্থায় তিনি থাকলেন। কেউ বুঝতে পারল না যে তিনি ইনতিকাল করেছেন। অনেকদিন পরে উই পোকা তাঁর লাঠি খেয়ে ফেললে লাঠি

ভেঙ্গে তাঁর শরীরটা পড়ে গেল। তখন সবাই বুঝতে পারলো যে তিনি ইনতিকাল করেছেন। বায়তুল মাকদাসে তাঁকে দাফন করা হয়। ইনতিকালের সময় তাঁর বয়স ছিল বায়ান্ন বছর।

তিনি সারা জীবন মানুষকে আল্লাহর দীনের পথে ডেকেছেন এবং সে অনুযায়ী দেশ শাসন করেছেন।

অনুশীলনী

১। হযরত সুলায়মান (আ) কে ছিলেন? কোরআন মজীদের কত স্থানে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে?

২। কত বছর বয়সে হযরত সুলায়মান (আ) রাজত্ব লাভ করেছিলেন, তিনি ক্ষেত ও বকরীর মালিকের ব্যাপারটি কিভাবে মীমাংসা করেছিলেন?

৩। বায়তুল মাকদাস ও হায়কালে সুলায়মানীর নির্মাণকারী কে? বায়তুল মাকদাস নির্মাণে কত বছর সময় লেগেছিল?

৪। তিনি ভারত থেকে সোনা, রূপা ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী কিভাবে নিয়ে যেতেন? তিনি ঘোড়া পালতেন কেন?

৫। আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ)-কে কি কি নিয়ামত দান করেছিলেন?

৬। রাণী বিলকিসের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা কর।

৭। হযরত সুলায়মানের ইনতিকালের ঘটনাটি বর্ণনা কর।

হযরত ইলিয়াস আলাইহিস সালাম

হযরত ইলিয়াস আলাইহিস সালাম বনী ইসরাঈলদের একজন বিখ্যাত নবী। তিনি হযরত মূসার (আ) ভাই হযরত হারুনের (আ) বংশধর। তিনি বর্তমান জর্ডান নদীর উত্তর অঞ্চলের জিল'আদ নামক স্থানের "আবেল মাহুলা" নামক জায়গার অধিবাসী ছিলেন। খৃষ্টান এবং ইয়াহুদদের কাছে তিনি ইলিশা নামে পরিচিত। তিনি খৃষ্টপূর্ব ৮৭৫ থেকে ৮৫০ সনের মাঝামাঝি সময়ে জন্মলাভ করেন।

মহান আল্লাহর ইচ্ছায় বনী ইসরাঈলদের মধ্যে বহু নবী আগমন করেন। এর পরও তারা বার বার সত্য পথ থেকে দূরে সরে যায়। যে সময় হযরত ইলিয়াস (আ) জন্মলাভ করেন সে সময় বনী ইসরাঈলগণ আবার আল্লাহর পথ ছেড়ে গোনাহর কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল।

হযরত সুলায়মানের (আ) সময় বনী ইসরাঈলদের প্রভাব- প্রতিপত্তি চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। কিন্তু তাঁর ইনতিকালের পর পরই বনী ইসরাঈলদের রাষ্ট্র দু' ভাগ হয়ে যায়। দক্ষিণ ফিলিস্তিনে একটি ছোট রাষ্ট্র কায়েম হয়। এর রাজধানী হয় বায়তুল মাকদাস। অন্যদিকে উত্তর ফিলিস্তিনে ইসরাঈল নামে একটি রাষ্ট্র কায়েম হয়। এর রাজধানী ছিল সামেরিয়া। উত্তর এলাকার ইসরাঈল নামক রাষ্ট্রে প্রথম থেকেই শিরক, মূর্তি পূজা, জুলুম-অত্যাচার ও লজ্জাহীনতা বেড়ে যেতে থাকে। এ অবস্থায় এ রাষ্ট্রের শাসক 'আখীআব' লেবাননের মুশরিক রাজ কন্যা ইযবেলকে বিয়ে করে। তার প্রভাবে পড়ে 'আখী আব' ও মুশরিক হয়ে যায়। স্ত্রী ইযবেলের কথামত সে রাজধানী সামেরিয়ায় 'বা'ল' দেবতার মন্দির ও বলির দেবী তৈরী করে এবং এক আল্লাহকে বাদ দিয়ে বা'ল দেবতার পুজা প্রচলনের চেষ্টা চালায়।

ঠিক এ সময় হযরত ইলিয়াস (আ) এর আবির্ভাব ঘটে। তিনি এসব পাপ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। লোকজনকে তিনি এ মূর্তি পূজার অপকারিতা বুঝাতে থাকেন। তিনি বাদশাহ 'আখী আবকে তার অন্যায় কাজকর্মের জন্য সাবধান করে দেন। তিনি বাদশাহকে বললেনঃ তুমি এসব অন্যায় বন্ধ না করলে তোমার রাষ্ট্রে আর এক বিন্দু বৃষ্টিও হবে না। আল্লাহর নবীর কথাই সত্য প্রমাণিত হলো। সেখানে সাড়ে তিন বছর পর্যন্ত বৃষ্টি হলো না। এমন অবস্থায় বাদশাহ ইলিয়াস (আ)-কে খুঁজে আনলেন এবং বৃষ্টির জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করতে বললেন। এ সময় হযরত ইলিয়াস (আ) বা'ল দেবতা এবং মহান আল্লাহর পার্থক্য মানুষের সামনে প্রকাশ করতে চাইলেন। তিনি বললেনঃ একটি প্রকাশ্য সভায় বা'ল দেবতার পূজারীরা তাদের দেবতার নামে কুরবানী করবে এবং আমি আল্লাহর নামে কুরবানী পেশ করবো। গায়েবী আগুন এসে কুরবানীকে পুড়িয়ে ফেলবে সেই সত্য পথের অনুসারী। 'আখী আব' প্রস্তাবটি মেনে নিল। সুতরাং কারমেল পর্বতে বা'ল দেবতার আটশত পূজারী এবং হযরত ইলিয়াস (আ) হাজার হাজার লোকের সামনে কুরবানী পেশ করলেন। গায়েবী আগুন এসে হযরত ইলিয়াসের (আ) কুরবানী পুড়িয়ে ফেললে সবাই তাঁর প্রভুর সত্যতা মেনে নিল। ইলিয়াস (আ) সেখানেই পূজারীদেরকে হত্যা করালেন। এরপর তিনি দো'আ করলেন। প্রচুর বৃষ্টি হলো। এতে প্রমাণ

হলো একমাত্র আল্লাহই সত্যিকার ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই সব ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। আর হযরত ইলিয়াস (আ) তাঁরই প্রেরিত নবী।

এই ঘটনার পর রাজা 'আখী আব' তার স্ত্রী ইযবেলের প্ররোচনায় হযরত ইলয়াসের (আ) শত্রু হয়ে গেল। সে শপথ করলঃ বা'ল দেবতার পূজারীদের যেভাবে হত্যা করা হয়েছে ইলিয়াসকেও সেভাবে হত্যা করবে। এ অবস্থায় হযরত ইলিয়াস (আ) দেশ ছেড়ে সিনাই মরুভূমির সিনাই পর্বতে গিয়ে আশ্রিয় নিলেন এবং কয়েক বছর পর্যন্ত সেখানেই কাটালেন। ঐ সময় তিনি আল্লাহর কাছে দো'আ করে বলতেনঃ 'হে আল্লাহ, বনী ইসরাঈলরা তোমার হুকুম-আহকাম পরিত্যাগ করেছে। তোমার নবীদের হত্যা করেছে। তোমার নবীদের মধ্যে এখন আমিই শুধু বেঁচে আছি। তারা আমাকেও হত্যা করতে চায়।

এ সময়েই বায়তুল মাকদাসের ইয়াহুদী রাষ্ট্রের শাসক ইয়াহুরাম ইসরাঈলের বাদশাহ 'আখী আবে'র মেয়েকে বিয়ে করে। ফলে তার রাজ্যেও শিরক ও বা'ল দেবতার পূজা শুরু হয়। হযরত ইলিয়াস (আ) ইয়াহুরামের কাছে পত্র লিখে তাকেও সাবধান করে দেন। কিন্তু তারা কেউই তাঁর কথায় কান দিলো না। অবশেষে তাদের ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসে। বিদেশীরা ইয়াহুরামের রাজ্যের উপর হামলা করে তাকে হত্যা করে এবং স্ত্রীকে বন্দী করে নিয়ে যায়। কিছু দিন পর সেও কঠিন পেটের পীড়ায় মারা যায়।

এর কয়েক বছর পর হযরত ইলিয়াস (আ) আবার ইসরাঈলে ফিরে গিয়ে 'আখী আব'কে সাবধান করে দেন। তার মৃত্যুর কিছুদিন পর হযরত ইলিয়াস (আ) ইনতিকাল করেন।

হযরত ইলিয়াস (আ) সারা জীবন অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। তিনি মানুষের কল্যাণ কামনা করেছেন। আর একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করেননি।

অনুশীলনী

১। যার সময়ে বন্দী ইসরাঈলদের প্রভাব প্রতিপত্তি চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল?

২। ইসরাঈল রাষ্ট্রে কি বেড়ে গিয়েছিলো?

৩। শাসক 'আখীআব' কিভাবে মুশরিক হয়েছিলো?

৪। বাল দেবতা ও মহান আল্লাহর মধ্যেযার পার্থক্য তুলে ধরার জন্য হযরত ইলিয়াস (আ) কি করলেন?

৫। হযরত ইলিয়াস (আ) বা'ল দেবতার পূজারীদের কিভাবে হত্যা করাতে সক্ষম হলেন?

৬। বাদশাহ হযরত ইলিয়াস (আ) কে হত্যা করতে চাইলো কেন?

৭। সিনাই পর্বতে হযরত ইলিয়াস (আ) কি বলে আল্লাহর কাছে দো'আ করতেন।

৮। হযরত ইলয়াস (আ) কার কাছে পত্র দিলেন এবং কেন?

৯। ইয়াহুরাম তার ও তার রাজ্যের পরিণতি কি হয়েছিলো লিখ?

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ছিলেন আল্লাহর একজন শ্রেষ্ঠ রসূল। তিনি বনী ইসরাঈল বংশে জন্মলাভ করেছিলেন এবং তাদের জন্যই রসূল হিসেবে এসেছিলেন। তাঁর জন্ম আল্লাহ তা'আলার অসীম শক্তির প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে মাতা-পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছিলেন। আর হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছিলেন পিতা ছাড়াই। হযরত মারিয়াম (আ) ছিলেন তাঁর মা। তাই তাঁকে ঈসা ইবনে মারিয়াম বলা হয়।

হযরত ঈসার (আ) মা হযরত মারিয়াম (আ) মায়ের পেটে থাকতেই তাঁর মা হান্না বিবি মানত করেছিলেন যে, তাঁর গর্ভের সন্তানকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ঘর বায়তুল মাকদাসের খাদেম বানাবেন। কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে দেখা গেল পুত্র সন্তান জন্মলাভ না করে মেয়ে সন্তান জন্মলাভ করেছে। তিনি তাঁর এ মেয়ের নাম রাখলেন মারিয়াম। একটু বড় হলে মেয়েকেই তিনি বায়তুল মাকদাসের খেদমতের জন্য নিয়োজিত করলেন। হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ছিলেন বায়তুল মাকদাসের মোতাওয়াল্লী। তিনি ছিলেন হযরত মারিয়ামের আত্মীয়। তাঁর তত্ত্বাবধানে তিনি বায়তুল মাকদাস সংলগ্ন একটি আলাদা কামরায় থাকতেন। অত্যন্ত পবিত্র পরিবেশে তিনি লালিত পালিত এবং বড় হতে থাকলেন। যাকারিয়া (আ) খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য মাঝে মাঝে তাঁর কামরায় প্রবেশ করতেন। যখনই তিনি যেতেন তখনই দেখতেন বালিকা মারিয়ামের কামরায় অনেক সুমিষ্ট ফল-মূল। এ দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে যেতেন। ভাবতেন অসময়ে মারিয়াম এসব কোথা থেকে পায়? একদিন তিনি মারিয়ামকে জিজ্ঞেস করলেনঃ মারিয়াম তুমি এসব ফল-মূল কোথা থেকে পাও? এ সব তো এখন পাওয়ার কথা নয়! মারিয়াম বললেনঃ মহান আল্লাহ আমাকে এ সব ফল-মূল দান করেন। এ সব ঘটনা থেকেই বুঝা যায় যে, হযরত মারিয়াম ছিলেন আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় পাত্রী।

মারিয়াম সেখানেই বড় হলেন এবং যৌবনে পদার্পণ করলেন। এ সময় একদিন আল্লাহর ফেরেশতা হযরত জিব্রাঈল (আ) তাঁর কাছে এসে বললেনঃ আমি আল্লাহর দূত। আল্লাহ আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। আমি তোমাকে (আল্লাহর হুকুমে) একটা সন্তান দান করবো। এ বলে হযরত জিব্রাঈল (আ) তাঁর বুকে একটি ফুঁ দিলেন। হযরত মারিয়াম গর্ভবতী হলেন এবং বায়তুল মাকদাসের অদূরে এক স্থানে একটি সন্তান প্রসব করলেন। তিনি সন্তানের নাম রাখলেন ঈসা। মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার পর পরই ঈসা কথা বলে উঠলেন। হযরত মারিয়াম অত্যন্ত খুশী হলেন। তাঁর সব দুঃখ দূর হয়ে গেল। লজ্জা ভয় কোন কিছুই আর তাঁর থাকলো না। শিশু সন্তান কোলে নিয়ে ফিরে আসতে দেখে দুশ্চরিত্র ইয়াহুদীরা তাঁকে অনেক গাল-মন্দ দিতে লাগলো। কিন্তু তিনি কোন কথা বললেন না, শুধু শিশুর দিকে ইশারা করলেন অর্থাৎ এ শিশুই সব কথা বলবে। সবাই বলে উঠলো, এ দোলনায় শায়িত শিশুর সাথে আমরা কেমন করে কথা বলবো? সে কি কথা বলতে পারবে? তখন শিশু নবী হযরত ঈসা (আ) কথা বলে উঠলেন।

তিনি বললেন, "আমি আল্লাহর বান্দা। আল্লাহ মানুষের হেদায়াতের জন্য আমাকে কিতাব দান করেছেন। তিনি আমাকে নবী হিসেবে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন।" সদ্য প্রসূত শিশুর মুখে এসব কথা শুনে সবাই তাজ্জব বনে গেল। তারা তাঁকে বিশ্বাস করলো এবং কোন কিছু না বলে চলে গেল।

হযরত ঈসা (আ) ধীরে ধীরে বড় হলেন এবং নবুওয়াত লাভ করলেন। এ সময় বনী ইসরাঈলগণ আল্লাহর সব নির্দেশ ভুলে গিয়েছিল। তারা শির্ক ও আরো অনেক গোনাহর কাজে লিপ্ত ছিল। রাজা বাদশারাই আবার বেশী করে আল্লাহ ও তাঁর আদেশ নির্দেশ ভুলে গিয়েছিল। এনটিওকস নামে এক রাজা তার আমলে জোর পূর্বক বায়তুল মাকদাসের মধ্যে মূর্তি স্থাপন এবং লোকজনকে তার পূজা করতে বাধ্য করেছিল। আল্লাহর নামে কুরবানী করা বন্ধ করে দিয়েছিল। যারা বাড়িতে তাওরাত গ্রন্থ রাখতো সে তাদের মৃত্যুদন্ড দেয়ার ব্যবস্থা করেছিল। হযরত ঈসা (আ) তাদের এসব অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করলেন। তারা যে সব অন্যায় কাজ করতো তিনি সে সব কাজ সম্পর্কেও তাদের সাবধান করে দিলেন।

ইয়াহুদরা তাঁর এসব কথা ভাল মনে করলো না। তারা তাঁর বিরোধিতা শুরু করলো। কেউ যাতে তাঁর কথা না মানে সেজন্যও তারা চেষ্টা করতে লাগলো। ইয়াহুদ আলেমরাও তাঁকে নবী বলে স্বীকার করলো না। হযরত ঈসা (আ) যখন দেখলেন যে, কেউ তাঁর কথা শুনছে না তখন তিনি সবাইকে ডেকে বললেন: আল্লাহর দ্বীনের কাজে আমাকে কে সাহায্য করতে পার? তাঁর এ আহবানে একদল মৎস্যজীবী জেলে তাঁর ওপর ঈমান এনে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। এঁদেরকে কোরআন মজীদে হাওয়ারী বলা হয়েছে। হাওয়ারীরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হযরত ঈসা (আ) কে সাহায্য করেছেন।

হযরত ঈসাকে (আ) আল্লাহ তা'আলা অনেক মু'জিযা দান করেছিলেন। তিনি আল্লাহর হুকুমে মৃত মানুষকে জীবিত করতে পারতেন। কুষ্ঠ ও অন্যান্য কঠিন রোগ ভাল করতে পারতেন। মাটি দিয়ে পাখি তৈরী করে তাতে ফুঁক দিলে তা জীবিত হয়ে উড়ে যেতো। লোকেরা কি খেতো এবং বাড়িতে কি জমা করে রাখতো আল্লাহর হুকুমে তাও তিনি বলতে পারতেন।

ইয়াহুদদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ এবং অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করার কারণে তারা তাঁর শত্রু হয়ে গেল এবং তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করলো। তারা দেশের শাসনকর্তার কাছে গিয়ে হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে এ বলে অভিযোগ করলো যে, তিনি লোকদের তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছেন। শাসনকর্তা ইয়াহুদদের কথায় বিশ্বাস করলো। সে হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যা করার জন্য লোক পাঠালো। ইয়াহুদরা তাঁকে গ্রেফতার করার ব্যাপারে সাহায্য করলো। গ্রেফতার করে তাঁকে একটি ঘরে বন্দী করে রাখা হয় এবং পরে শূলে চড়িয়ে হত্যা করার সিদ্ধান্ত হয়। তাঁকে ধরে আনার জন্য প্রথমে ঘরের মধ্যে একটি লোক প্রবেশ করে। কিন্তু সে হযরত ঈসা (আ)-কে

সেখানে দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। পরে অন্যান্য লোকেরা সেখানে গিয়ে ঐ লোকটিকে হযরত ঈসা (আ)-এর আকৃতিতে দেখতে পায় এবং তাঁকে ঈসা মনে করে শুলে চড়িয়ে হত্যা করে।

এদিকে হয়েছে কি! আল্লাহ তাঁর প্রিয় রসূলের এরূপ বিপদ দেখে তাঁকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেন। তিনি নিজের অসীম কুদরতে তাঁকে উঠিয়ে নেন। আর যে লোকটি হযরত ঈসা (আ)-কে ধরে আনার জন্য প্রথমে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল তাকে ঈসার আকৃতি দান করেন। লোকেরা মনে করলো সেই বুঝি ঈসা। তাই তাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করলো। মহান আল্লাহ এভাবে তাঁর নবীকে রক্ষা করলেন।

কিয়ামতের পূর্বে দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য তিনি আবার দুনিয়াতে আসবেন। তবে তখন তিনি নবী হিসেবে আসবেন না।

অনুশীলনী

১। হযরত ঈসাকে (আ) ঈসা ইবনে মারিয়াম বলা হয় কেন?

২। হযরত মারিয়ামের কামরায় গিয়ে হযরত যাকারিয়া (আ) কি দেখতে পেতেন?

৩। কিভাবে বুঝা যায় যে, হযরত মারিয়াম আল্লাহর প্রিয় পাত্রী ছিলেন?

৪। ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল এসে মারিয়ামকে কি বললেন?

৫। দুশ্চরিত্র ইয়াহুদরা হযরত মারিয়ামকে গাল-মন্দ দিল কেন? জবাবে তিনি কি বললেন?

৬। বনী ইসরাঈলদের অবস্থা কিরূপ ছিল?

৭। হযরত ঈসার (আ) ডাকে কারা সাড়া দিয়েছিল? তাঁর কি কি মু'জিযা ছিল?

৮। ইয়াহুদরা তাঁর শত্রু হলো কেন? তিনি আবার কি দুনিয়ায় আসবেন?

শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে যত নবী ও রসূল পাঠিয়েছেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল। তিনি ৫৭০ ঈসায়ী সনে আরব দেশের মক্কা নগরে জন্মলাভ করেছিলেন। তিনি আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ বংশ কুরাইশ বংশে জন্মলাভ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ আর মায়ের নাম আমিনা। জন্মের কয়েক মাস পূর্বেই পিতা ইনতিকাল করেন। আর জন্মের ছয় বছর পর ইনতিকাল করেন মা।

তোমরা জান মানুষ যখনই আল্লাহকে ভুলে যেতো এবং নানা রকম অন্যায় কাজ-কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়তো তখনই আল্লাহ তাদের সৎ পথে আনার জন্য নবী এবং রসূল পাঠাতেন। হযরত মুহাম্মাদ (স)-কেও আল্লাহ তা'আলা একই উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে ছিলেন। তবে তাঁর আগে যত নবী ও রসূল দুনিয়াতে এসেছিলেন তাঁদের একটা জাতি বা এলাকার জন্য পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে পাঠানো হয়েছিল সারা দুনিয়ার জন্য। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সারা দুনিয়ার মানুষকে হিদায়াত করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন শেষ নবী ও রসূল। তাঁর পর আর কোন নবী বা রসূল আসবেন না।

তিনি যে সময় আরবে জন্মলাভ করেন সে সময় আরবের মানুষেরা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তারা পরস্পর মারামারি করতো। গোত্রে-গোত্রে ও এলাকায় এলাকায় সব সময় হিংসা বিদ্বেষ লেগেই থাকতো। মানুষ মানুষকে খুন করতে মোটেই পিছপা হতো না। মেয়েদের সাথে তারা জঘণ্য ব্যবহার করতো। কারো ঘরে মেয়ে জন্ম নিলে তাকে জীবিত পুঁতে ফেলতো। ভাল ব্যবহার তারা জানতো না। লজ্জা-শরম বলতে কিছুই তাদের ছিল না। তারা উলঙ্গ হয়ে কা'বা ঘরে তাওয়াফ করতো। হাটে-বাজারে মানুষ কেনা-বেচা করতো। যে সব মানুষদের তারা কিনে আনতো তাদের বলা হতো দাস। দাসদের তারা নির্দয়ভাবে শাস্তি দিতো। তাদের দিয়ে কঠিন কঠিন কাজ করাতো কিন্তু ঠিকমত খেতে দিতো না। আসরে বসে পাল্লা দিয়ে মদ খেতো, জুয়া খেলতো। গর্ব আর অহংকার করা ছিল তাদের স্বভাব। এ ধরনের আরো অনেক খারাপ কাজ তারা করতো।

এরূপ এক অসভ্য সমাজে আমাদের শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) জন্মলাভ করেন। আরবের সম্ভ্রান্ত খানদানের নিয়ম অনুসারে জন্ম লাভের পর নবী (স)-কে মক্কার বাইরের এক বেদুইন পরিবারে হালীমা নাম্মী এক ধাত্রীর কাছে প্রতিপালনের জন্য দিয়ে দেয়া হলো। হালীমা তাঁকে নিজের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এখানকার মুক্ত আলো বাতাসে নবী (স) বড় হয়ে উঠতে লাগলেন। হালীমা তাঁকে আপন সন্তানের মত আদর যত্ন করতেন। হালীমার আদর-স্নেহ ও যত্নে লালিত পালিত হয়ে একটু বড় হলে তিনি তাঁকে নিয়ে মক্কায় এলেন এবং তাঁর মা আমিনার কাছে নিয়ে গেলেন।

বিবি আমিনা শিশু নবী মুহাম্মাদ (স)-কে সাথে করে মদীনায় তাঁর বাপের বাড়িতে গেলেন। উদ্দেশ্য ছিল সেখানে গিয়ে স্বামীর কবর যিয়ারত করা। মদীনা থেকে ফেরার সময় পথিমধ্যে আমিনাও ইনতিকাল করলেন। তিনি রেখে গেলেন ছয় বছরের ইয়াতীম মুহাম্মাদ (স)-কে দাসী উম্মে আয়মান তাঁকে সাথে করে মক্কায় ফিরে এলেন। তখন থেকে তাঁকে প্রতিপালনের ভার নিলেন দাদা আবদুল মুত্তালিব। দাদা তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কিন্তু দু' বছর পর দাদাও মারা গেলেন। এবার মহানবীর লালন-পালন ও দেখা শোনার ভার নিলেন চাচা আবু তালেব।

চাচা তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন। তিনিও বিভিন্ন কাজে চাচাকে সাহায্য করতেন। একবার ব্যবসা উপলক্ষে চাচা তাঁকে সিরিয়ায় নিয়ে গিয়েছিলেন।

নবী (স) কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করলেন। তিনি কাউকে ঠকাতেন না। মিথ্যা কথা বলতেন না। সবাই মদ পান করতো কিন্তু তিনি মদ স্পর্শও করতেন না। কারো সাথে ঝগড়া করতেন না। সাধ্যমত গরীব ও অসহায়দের সাহায্য করতেন। তাঁর চরিত্র ছিল অতি পবিত্র। তাই লোকে তাঁকে আল-আমীন বা বিশ্বাসী বলে ডাকতো। লোকেরা তাঁর কাছে মূল্যবান জিনিস-পত্র আমানত রাখতো।

এ সময় মক্কায় একজন ধনী মহিলা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল খাদীজা। তিনি সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশের মেয়ে। তাঁর ছিল বিরাট ব্যবসা। অঢেল ছিল তাঁর ধন-সম্পদ। তিনি ছিলেন সৎ। তাঁর ব্যবহার ছিল কোমল। তাঁর সৎ চরিত্র ও কোমল ব্যবহারের কারণে সবাই তাঁকে 'তাহেরা' বা পবিত্র মহিলা বলে ডাকতো। তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য দেখা শোনার জন্য এক সময় একজন সৎ ও বিশ্বাসী লোকের দরকার হয়ে পড়লো। তিনি নবীকে (স) তাঁর এ কাজের জন্য মনোনীত করলেন।

খাদীজার ব্যবসায়ের পণ্য সম্ভার নিয়ে নবী (স) সিরিয়ায় রওয়ানা হলেন। সাথে গেল খাদীজার ক্রীতদাস মায়সারা। এ দীর্ঘ সফরে সে নবী (স) সংগী হলো। নবীর (স) সাহচর্যে থেকে সে তাঁর চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে গেল। সিরিয়া থেকে ফিরে এসে নবী (স) খাদীজাকে অনেক মুনাফা বুঝিয়ে দিলেন। ইতিপূর্বে এতো মুনাফা আর কেউ তাঁকে দেয়নি। ক্রীতদাস মায়সারাও তাঁর চরিত্র, কোমল ব্যবহার, মধুর গুণাবলী ও বুদ্ধিমত্তার কথা- খাদীজাকে জানালো। খাদীজা তাঁর সততা ও পবিত্র চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। চাচা আবু তালিবের সাথে পরামর্শ করে নবী (স) খাদীজাকে বিয়ে করলেন।

নবী (স)-র সন্তানদের মধ্যে একমাত্র ইবরাহীম ছাড়া আর সবাই খাদীজার (রা) গর্ভে জন্মলাভ করেন। খাদীজার গর্ভজাত পুত্র সন্তানদের নাম ছিল-কাসেম, তাইয়েব ও তাহের। পুত্র সন্তানদের সবাই তাঁর নবুওয়াত লাভের পূর্বেই ইনতিকাল করেন। মেয়ে সন্তানগন ছিলেন: যায়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতেমা। এরা সবাই বেঁচে ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সবাই আবার তাঁর সাথে মক্কা থেকে হিজরতও করেছিলেন। সর্ব কনিষ্ঠা কন্যা ফাতেমা ছাড়া অন্য কোন কন্যার কোন সন্তান ছিল না।

হেরা গুহায় রাত্রি যাপন ও অহী প্রাপ্তি

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স যতই বাড়তে থাকলো ততই তিনি তাঁর কওমের লোকদের অজ্ঞতা ও মুর্খতা দেখে ব্যথিত হয়ে উঠলেন। তিনি দেখতেন সৃষ্টির সেরা মানুষগুলো অসহায় মাটির মূর্তির সামনে মাথা নত করে সিজদা করছে, কাকুতি মিনতি করছে। তিনি প্রায়ই চিন্তা করতেন তাঁর জাতিকে এসব থেকে কি করে উদ্ধার করবেন? এরপর তিনি হেরা পর্বতের গুহায় রাত কাটাতে শুরু করলেন। দু' তিন দিনের খাবার এবং পানি নিয়ে যেতেন এবং তা শেষ হয়ে গেলে আবার এসে নিয়ে যেতেন। কোন কোন সময় স্ত্রী খাদীজাও তাঁর খাবার দিয়ে আসতেন। এ ভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। একদিন প্রত্যুষে তিনি হেরা গুহায় অবস্থান করছিলেন। এ সময় আল্লাহর ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ) এসে তাঁকে একখন্ড রেশমী কাপড়ে লেখা আল্লাহর বাণী পড়তে বললেন। তিনি বললেন: আমি তো পড়তে জানি না। তখন

ফেরেশতা তাঁকে বুকে চেপে ধরলেন। এরপর আবার আল্লাহর বাণী লিখিত কাপড় খন্ড সামনে ধরে পড়তে বললে নবী (সা) তা অনায়াসে পড়লেন। এটি ছিল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীর (স) কাছে প্রথম অহী-সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত। আয়াতগুলোর অর্থ হলোঃ

পড় তোমার রবের নামে। যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে 'আলাক' হতে সৃষ্টি করেছেন। পড়, তোমার রব সর্বাপেক্ষা অনুগ্রহশীল ও দয়াবান। যিনি কলমের সাহায্যে মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান শিখিয়েছেন যা সে জানতো না।

ভয়ে ভয়ে বাড়ি ফিরলেন

হেরা গুহার এ ঘটনা ছিল নবীর (স) কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর। ফেরেশতা চলে যাওয়ার পর তিনি ভয় ও বিস্ময় নিয়ে দ্রুত বাড়ি ফিরলেন। খাদীজাকে ডেকে বললেনঃ আমার শরীর কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও। পরে খাদীজাকে সব কথা খুলে বললেন। এতে তাঁর ভয় ও আশংকাও প্রকাশ করলেন। খাদীজা ছিলেন খুব বুদ্ধিমতী মহিলা। তিনি তাঁকে অভয় ও সান্তনা দিলেন। তিনি বললেনঃ আল্লাহ কখনো আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো সব সময় ভাল কাজ করেন। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন। গরীব, দুঃখীদের কষ্ট দূর করেন, আমানতদারী রক্ষা করেন, সত্য কথা বলেন, উপার্জন করে অসহায়দের দান করেন, মেহমানদের আপ্যায়ন করেন এবং ভাল কাজে সাহায্য করেন। অতএব আপনার ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই।

পরে তিনি নবীকে (স) সাথে করে ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে নিয়ে গেলেন এবং পুরো ঘটনা তাকে শুনালেন। নওফেল ছিলেন বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে একজন পারদর্শী ব্যক্তি। সব শুনে তিনি বললেনঃ হেরা গুহায় যিনি এসেছিলেন তিনি হলেন আল্লাহর অহী বহনকারী ফেরেশতা জিব্রাঈল (আ)। তিনিই আগের যুগের সব নবীর কাছে অহী আনতেন। ওয়ারাকা ইবনে নওফেল তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝাতে পারলেন যে, হযরত মুহাম্মাদ (স)কে আল্লাহ তা'আলা তার রসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন। তাই তিনি তাকে বললেনঃ আমি যদি সে সময় যুবক হতাম এবং বেঁচে থাকতাম যখন আপনার কওম আপনাকে অস্বীকার করবে এবং দেশ থেকে বের করে দেবে তখন আপনাকে যতোপযুক্তভাবে সাহায্য করতে পারতাম। তার একথা শুনে রসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেনঃ তারা কি আমাকে বহিস্কার করবে? তিনি বললেনঃ হাঁ, যিনিই এ দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন তার সাথেই তার কওম অনুরূপ আচরণ করেছে।

এরপর নবী (স) ও হযরত খাদীজা (রা) বাড়ি ফিরে আসলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, অচিরেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর ওপর একটি গুরু দায়িত্ব অর্পিত হতে যাচ্ছে। অর্থাৎ আল্লাহর প্রভুত্ব মেনে নেয়ার জন্য গোটা দুনিয়াবাসীকে আহবান জানাতে হবে এবং তা কায়েম করতে হবে। এর অর্থ হলো মানুষকে আহবান জানাতে হবে যেন তারা তাকেই আল্লাহর নবী বলে স্বীকার করে নেয়।

এরপর অল্প কিছু দিন অহী বন্ধ থাকার পর ধারাবাহিকভাবে অহী নাযিল শুরু হয়। নবী (স)কে তাওহীদ ও ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ অবহিত করা হয়। সাথে সাথে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। সে অনুসারে তিনি গোপনে- চুপিসারে বিশ্বস্তজনদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। তাঁর এ আহবানে দু' একজন করে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকেন।

প্রথম দিকে বিবি খাদীজা, হযরত আবু বকর, হযরত আলী, হযরত যায়েদ, হযরত উসমান (রা) প্রমূখ সাহাবাগণ ইসলাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু মক্কার বড় বড় নেতারা নবীর (স) শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। তারা দেখলো, মুহাম্মাদের (স) প্রচারিত ইসলাম মানলে তাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে। তারা আর নেতা থাকতে পারবে না। কারণ, তখন ভাল লোকেরা হবে নেতা। তাই তারা বিরোধিতা শুরু করলো। এসব বিরোধীদের মধ্যে আবু জেহেল, আবু লাহাব ও আবু সুফিয়ান ছিলো অন্যতম। তারা নবী (স) ও তাঁর সাহাবাদের হেয় করার জন্য শুরু করলো ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও হাসি মশকরা। তারা মনে করতো, এভাবে তাদের সমাজের সামনে হেয় ও লজ্জিত করলে তারা হতোদ্যম হয়ে যাবে এবং লোকজনও তাদের কথা শুনবে না। কিন্তু নবী (স) ও ঈমানদারগণ দমলেন না এবং এর পরও লোকজন দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকলো।

শুরু হলো জুলুম

মক্কার নেতারা এবার প্রমাদ গুনলো। তারা দেখলো যত সহজে তারা ইসলামের এ আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দিতে চেয়েছিল। তা তত সহজে সম্ভব নয়। নতুন এ আদর্শ ইসলামের নেতা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) তার এ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ। কোন ভাবেই তাকে এ পথ থেকে বিচ্যুত করা সম্ভব নয়। আবার যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারাও এর মধ্যে কি যেন একটা মনের পরিতৃপ্তি লাভ করেছে, যা তারা কোনভাবেই পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। তাই তারা জুলুম-অত্যাচার চালানোর সিদ্ধান্ত নিলো। শুরু হলো অত্যাচার নির্যাতন।

নবী (স) ছিলেন মক্কার তথা আরবের শ্রেষ্ঠ গোত্রের শ্রেষ্ঠ শাখার শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাঁর চাচা আবু তালিব ছিলেন প্রভাবশালী ও সম্মানিত নেতা। তাকে লঙ্ঘিত করা ছিল বেশ কঠিন কাজ। তাই কুরাইশরা সুযোগের অপেক্ষায় থাকলো। কিন্তু অন্যান্য মুসলমানদের ওপর তাৎক্ষণিকভাবেই অত্যাচার শুরু হয়ে গেল। কারণ, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের বেশির ভাগই ছিল সমাজের দরিদ্র, প্রভাবহীন, ও ক্রীতদাস। ক্রীতদাসদের মালিকরা, তাদের ক্রীতদাসদের ওপর এবং আশাপাশের প্রভাবশালী ও প্রধানরা নিজ নিজ পরিমন্ডলে দরিদ্র ও অসহায়দের ওপর অত্যাচার চালাতে শুরু করলো। কিন্তু তারা বিস্মিত হয়ে দেখলো, অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও নান রকম হয়রানি সত্বেও কেউ নতুন দীন ও আদর্শ ইসলাম পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। বরং ইসলামকে আঁকড়ে থাকার ব্যাপারে তাদের সংকল্প যেন আরো কঠোর থেকে কঠোরতর হচ্ছে। তাই এবার শুরু হলো নির্দয় ও নির্মম নির্যাতন।

হাবশায় হিজরত

মুসলমানদের ওপর অত্যাচার বেড়ে চললো এবং তা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকলো। যারা এসব নির্যাতনের শিকার হলেন তাদের মধ্যে ছিলেন বেলাল, আম্মার, সুহায়েব, খুবায়েব, সুমাইয়া, খাব্বাব এবং আরো অনেকে। তখনো পর্যন্ত নবী (স) এর ওপর তেমন কোন আক্রমণ না হলেও তারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। কারণ তখনো পর্যন্ত প্রকাশ্যে নবী (স)কে কিছু বলার মত পরিস্থিতি তারা তৈরি করতে পারেনি। সাধারণ মুসলমানদের ওপর অত্যাচার প্রচন্ড আকার ধারণ করলে নবী (স) সবাইকে বললেন: তোমরা যদি এ সময় হাবশায় হিজরত করতে তাহলে সেটিই ভাল হতো। সে দেশ এমন কজেন বাদশা শাসন করেন যার শাসনাধীনে কেউ কাউকে জুলুম করতে পারে না। ভাল কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সেখানে গিয়েই অবস্থান করো।

রাসূল (স) এর এ ঘোষণার পর কিছু কিছু মুসলমান হাবশায় হিজরত করার সিদ্ধান্ত নিল। প্রথম পর্যায়ে এগারজন পুরুষ এবং চারজন মহিলা হিজরত করলেন। তারা একটি জাহাজ ভাড়া করে হাবশার উপকূলে অবতরণ করে পরে দেশটির রাজধানীতে গিয়ে পৌঁছলেন। এরপর একের পর এক দলে দলে মুসলমানরা হাবশায় পৌঁছতে থাকলেন। সর্বসাকুল্যে তাদের সংখ্যা দাঁড়ালো একশত একজনে। এর মধ্যে তিরাশি জন ছিলেন পুরুষ ও আঠার জন মহিলা। ঈমান-আকীদা তথা আদর্শের জন্য এ ছিল এক চরম ত্যাগ ও অনুপম দৃষ্টান্ত।

হাবশা থেকে মুসলমানদের প্রত্যাবর্তন

হাবশায় পৌঁছে মুসলমানগণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। বাদশাহ নাজ্জাশির সুশাসনের অধীনে মুসলমানগণও বেশ শান্তিতেই বসবাস করতে থাকলেন। কিন্তু কিছুদিন পর মুসলমানদের কাছে এ মর্মে একটা খবর পৌঁছলো যে, মক্কার মুশরিকরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছে। এখন আর কোন প্রকার জুলুম-নির্যাতন সেখানে নেই। তাই তারা কাল বিলম্ব না করে মক্কায় ফিরে আসার জন্য রওয়ানা হলেন। কিন্তু মক্কা থেকে এক দিনের পথ দূরে থাকতে তারা জানতে পারলেন যে, খবরটি সত্য নয়। মুশরিকদের মুসলমানদের সাথে কোন প্রকার সমঝোতা হয়নি । অনেকেই তাই পথিমধ্যে থেকে পুনরায় ফিরে গেলেন। আর কিছু সংখ্যক মুসলমান চুপিসারে মক্কায় ফিরে আসলেন। তাছাড়া কেউ কেউ কোন কোন মুশরিকের নিরাপত্তাধীনে মক্কায় পৌঁছলেন।

হাবশায় দ্বিতীয় হিজরত

যারা হিজরত করেছিলেন এবার তাদের ওপর পুরোদমে নির্যাতন শুরু হলো। প্রত্যেকের পরিবারের লোক তাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাতে থাকলো। কারণ, তারা অবগত হয়েছিলো যে, হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশি তাদের সাথে খুব ভাল আচরণ করেছেন এবং তারা সেখানে বেশ নিরাপদেই ছিলো। এ অত্যাচার দেখে রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে আবার হাবশায় হিজরত করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কুরাইশরা সতর্ক হয়ে যাওয়ায় এবার হিজরত করা ছিলো অত্যন্ত কঠিন। তা সত্বেও আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের সাহায্য করলেন। এবারও তারা কুরাইশদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করে পুনরায় হাবশায় গিয়ে পৌঁছলেন।

মুহাজিরদের বিরুদ্ধে মক্কার কাফেরদের ষড়যন্ত্র

মক্কার মুশরিক নেতারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রোশে ফেটে পড়লো। কারণ মুসলমানরা নিজেদের দীন ও ঈমান রক্ষা করে তাদের নির্যাতনের হাত থেকে বেঁচে একটি নিরাপদ জায়গায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। তারা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলো, মুসলামানদের দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং নির্যাতনের মাধ্যমে নতুন ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করতে হবে। তাই তারা বাদশাহ নাজ্জাশির দরবারে একটা কূটনৈতিক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করবে। অতএব তারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও ধূরন্ধর দুইজন লোক বাছাই করলো। তারা হলো আমর ইবনুল 'আস ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু রাবি'আ। তারা বাদশা নাজ্জাশি ও তার দরবারের পাদ্রি-পুরোহিতদের জন্য মুল্যবান উপহার সামগ্রী নিয়ে হাবশায় গিয়ে হাজির হলো। পাদ্রি-পুরোহিতগণ বহুমূল্য উপহার সামগ্রী পেয়ে খুশি হয়ে তাদেরকে সহযোগিতা দানের আশ্বাস দিল।

পাদ্রিদের সহযোগিতার আশ্বাস পেয়ে প্রতিনিধি দল বাদশার দরবারে হাজির হলো। তারা বললোঃ হে বাদশাহ, আমাদের কতিপয় অবুঝ যুবক আপনার দেশে পালিয়ে এসেছে। তারা বাপদাদার ধর্ম পরিত্যাগ করেছে। আপনার ধর্মও গ্রহণ করেনি। তারা একটি নতুন ধর্ম গ্রহণ

করেছে যা আপনার ও আমার সবাইর অজানা। তাদের বাপ-চাচা ও গোত্রপতিরা আমাদেরকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। কড়া নজরদারির মাধ্যমে তারা এদের সব রকমের কল্যাণ নিশ্চিত করতে চায়, প্রতিনিধি দল এভাবে চটকদার ভাষায় তাদের আবেদন পেশ করলে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে দরবারের পাদ্রিরা বলে উঠলোঃ বাদশাহ নামদার, তারা ঠিকই বলছেন। আপনি ঐ সব যুবককে তাদের হাতে তুলে দিন। তারা ওদের নিয়ে তাদের দেশে আত্মীয়-স্বজনের কাছে পৌঁছিয়ে দেবেন।'

বাদশাহ তাদের কথা শুনলেন না

বাদশাহ বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলেন। তিনি ভাবলেন, এ লোকগুলো আর কোন দেশে না গিয়ে আমার দেশে আশ্রয় নিয়েছে। সবদিক বিবেচনা না করে তাদেরকে ফেরত পাঠানো ঠিক হবে না। তাই তিনি আশ্রয়প্রার্থী মুসলমানদের পরের দিন দরবারে ডেকে পাঠালেন। খবর পেয়ে মুসলমাগণ নাজ্জাশির রাজ দরবারে হাজির হলেন। তাদের সিদ্ধান্ত হলো, পরিণতি যাই হোক না কেন তারা প্রকৃত ঘটনা বাদশাহর সামনে তুলে ধরবেন। মুসলমানদের পক্ষ থেকে নবী (স) এর চাচাতো ভাই জা'ফর ইবনে আবু তালেব বক্তব্য পেশ করার দায়িত্ব পেলেন। মুসলমাগণ হাজির হলে বাদশাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ যে দীনের কারণে তোমরা বাপদাদার ধর্ম পরিত্যাগ করেছো আবার আমার ধর্মও গ্রহণ করোনি, সেটা কেমন ধর্ম? মুসলমানদের পক্ষে হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব (রা) জবাব দিতে গিয়ে বললেনঃ

হে বাদশাহ, আমরা ছিলাম এমন এক জাতি যারা জাহেলিয়াত তথা অজ্ঞতার গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত ছিলাম। আমরা মূর্তির পূজা করতাম। মৃত জন্তু খেতাম। ব্যাভিচার করতাম, প্রতিবেশীদের সাথে খারাপ আচরণ করতাম। আমাদের শক্তিশালীরা দুর্বলদের অধিকার নস্যাত করতো। আমরা যখন এ অবস্থার মধ্যে ডুবে ছিলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্যে থেকে আমাদের কাছে একজন রাসূল পাঠালেন। তার বংশমর্যাদা ও সততা সম্পর্কে আমরা অবহিত ছিলাম। তিনি আমানতদার ও সম্ভ্রমশালী। তিনি আমাদেরকে এক আল্লাহর উপাসনা করতে এবং যেসব দেবদেবীর পূজা আমরা করতাম তা পরিত্যাগ করতে আহবান জানালেন। তিনি আমাদের আহবান জানালেন আমানত আদায় করতে, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতে, প্রতিবেশীর সঙ্গে ভাল আচরণ করতে, হারাম কাজ করা ও রক্তপাত থেকে বিরত থাকতে। তিনি আমাদের নিষেধ করলেন ব্যাভিচার করতে, মিথ্যা বলতে, ইয়াতীমের মাল খেতে, পবিত্র নারীদের অপবাদ দিতে। তিনি আমাদেরকে আদেশ দিলেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে এবং তার সাথে কাউকে শরীক না করতে। আদেশ দিলেন নামায পড়তে, যাকাত দিতে, রোযা রাখতে এবং আরো অনেক সুকৃতি করতে ও দুস্কৃতি বর্জন করতে। আমরা তাকে সত্য বলে মেনে নিলাম এবং তিনি আল্লাহর যে সব নির্দেশ জানালেন তা অনুসরণ করতে থাকলাম এতে আমাদের কওমের লোকজন আমাদের প্রতি চরম বৈরী আচরণ শুরু করলো এবং এ বিশ্বাস ত্যাগ করানোর জন্য আমাদের প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে উঠলো। অবস্থা যখন আমাদের বরদাশতের বাইরে চলে গেল তখন আমরা অন্য কোথাও না গিয়ে আপনাকে এবং আপনার দেশকে আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নিলাম। হে বাদশাহ, আমাদের বিশ্বাস যে, এখানে আমাদের ওপর কোন নির্যাতন হবে না।

সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে নাজ্জাশি জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নবীর কাছে যেসব বাণী এসেছে তার কোন অংশ কি তোমাদের কাছে আছে? হযরত জা'ফর (রা) বললেন, হ্যাঁ। নাজ্জাশী বললেনঃ আমাকে পড়ে শুনাও। হযরত জা'ফর (রা) সূরা মারিয়াম এর প্রথম দিকের কিছু অংশ তেলাওয়াত করলেন। তা শুনে নাজ্জাশীর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকলো। এমনকি তার দাড়ি ভিজে গেল। দরবারের পাদ্রি-পুরোহিতগণও কাঁদলেন। অশ্রুতে তাদের বই পুস্তকও ভিজে গেল। নাজ্জাশী বললেন, এ বাণী এবং ঈসা (আ) এর ওপর নাযিল হওয়া বাণী একই উৎস থেকে নির্গত। তারপর তিনি কুরাইশ প্রতিনিধি দু'জনকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ তোমরা চলে যাও। আল্লাহর শপথ! আমি তাদেরকে কখনো তোমাদের হাতে তুলে দেবনা। তারা এবার ব্যর্থতা নিয়ে মক্কায় ফিরে এলো।

হযরত উমর (রা) এর ইসলাম গ্রহণ

আমর ইবনুল 'আস ও আব্দুল্লাহ ইবনে আবু রাবি'আ চরম ব্যর্থতা নিয়ে হাবশা থেকে ফিরে এলে কুরাইশদের ক্রোধের আগুন আরো জ্বলে উঠলো। ঠিক এই সময়েই হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটা ঘটে আকস্মিকভাবে। তার বোন ফাতেমা ও ভগ্নিপতি সাঈদ ইবনে যায়েদ গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত ফাতেমাকে কুরআন শিক্ষা দিতেন।

আমর ইবনুল 'আস ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু রাবি'আ হাবশা থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার পর একদিন নবী (স) সাফা পর্বতের পাদদেশে একটি বাড়িতে কিছু সংখ্যক সাহাবার সাথে সমবেত হন। এ খবর পেয়ে উমর ইবনুল খাত্তাব খোলা তরবারি নিয়ে সেদিকে রওয়ানা হন। পথে নাঈম ইবনে আবদুল্লাহর সাথে তার সাক্ষাত হয়। নাঈমও গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কেউ তা জানতো না। উমরের গতিবিধি তার কাছে ভাল মনে না হওয়ায় তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ উমর কোথায় যাচ্ছ? উমর জবাব দিলেনঃ ধর্মত্যাগী মুহাম্মদ (স) এর সাথে বুঝাপড়া করতে যাচ্ছি। নাঈম ইবনে আবদুল্লা তাকে বললেনঃ উমর, তুমি কি মনে করো মুহাম্মাদকে হত্যা করার পর বনী আবদে ও মানাফ তোমাকে জীবিত ছেড়ে দেবে? এর চেয়ে বরং নিজের পরিবার ও আপনজনদের খবর নাও এবং তাদেরকে সংশোধন করো। উমর জিজ্ঞেস করলেন, আমার পরিবারের কে? নাঈম বললেনঃ তোমার ভগ্নিপতি সাঈদ ইবনে যায়েদ ও বোন ফাতেমা বিনতে খাত্তাব ইসলাম গ্রহণ করেছে।

উমর বোনের বাড়িতে উপস্থিত হলেন

একথা শোনার পর কালবিলম্ব না করে উমর বোনের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলেন। সে সময় খাব্বাব ইবনুল আরাতও তাদের বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। তাদের কাছে একটি সহীফায় সূরা ত্ব-হা লেখা ছিল। তিনি তাদেরকে তা শিক্ষা দিচ্ছিলেন। উমরের উপস্থিতি বুঝতে পেরে তারা খাব্বাবকে ঘরের মধ্যেই এক জায়গায় লুকিয়ে রাখলেন। আর ফাতেমা সহীফাখানা নিজের উরুর নীচে লুকিয়ে ফেললেন। বাড়িতে প্রবেশের মুহূর্তেই উমর শুনতে পেলেন খাব্বাব কি যেন পড়ে শুনাচ্ছেন। ভিতরে প্রবেশ করে উমর জিজ্ঞেস করলেনঃ আমি কিসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম? তারা বললেনঃ কিছু না।

উমর বললেনঃ আমি জানতে পেরেছি, তোমরা মুহাম্মাদ (স) এর দ্বীন গ্রহণ করেছো। এ কথা বলেই তিনি ভগ্নিপতি সাঈদ ইবনে যায়েদকে ধরলেন। ফাতেমা স্বামীকে রক্ষা করতে অগ্রসর

হলে উমর তাকে আঘাত করে আহত করলেন। এতে ফাতেমা ও তার স্বামী দৃঢ় কণ্ঠে বললেন: হাঁ, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। এখন তোমার যা ইচ্ছা করতে পার। এতে উমর লজ্জিত হলেন। তিনি বোনকে বললেনঃ তোমরা এইমাত্র যা পড়ছিলে তা আমাকে দাও। আমি দেখতে চাই মুহাম্মাদ (স) কি নিয়ে এসেছেন? এতে ফাতেমা তার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কিঞ্চিত আশাবাদী হয়ে বললেনঃ ভাইজান, আপনি মুশরিক, আপনি অপবিত্র। ঐ জিনিস পবিত্রতা ছাড়া কেউ স্পর্শও করতে পারে না। এ কথা শুনে উমর গোসল করে পবিত্র হলেন। অতঃপর সহীফাখানা নিয়ে পড়লেন। কিছুটা পাঠ করার পরই বলে উঠলেনঃ কি সুন্দর ও কত উন্নত এই কথাগুলো! উমরের মুখ থেকে একথা উচ্চারিত হতে দেখে খাব্বাব (রা) গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে উমরের সামনে এসে বললেনঃ হে উমর, আল্লাহর শপথ! আমার মনে হয় আল্লাহর নবী (স) এর দোয়া তোমার জন্যই নির্দিষ্ট হয়েছে। গতকালও আমি নবী (স)কে এ বলে দোয়া করতে শুনেছিঃ হে আল্লাহ, আবুল হাকাম ইবনে হিশাম (আবু জেহেল) অথবা উমর ইবনুল খাত্তাবের দ্বারা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করো। হে উমর আল্লাহকে ভয় করো।'

উমর বললেনঃ হে খাব্বাব, মুহাম্মাদ (স) কোথায় আছেন আমাকে সেখানে নিয়ে চলো। আমি ইসলাম গ্রহণ করবো। খাব্বাব তাকে বললেন যে, তিনি এখন সাফা পর্বতের পাদদেশে একটি বাড়িতে আছেন। 'উমর উন্মুক্ত তরবারি হাতে রাসূলুল্লাহ(স) ও তাঁর সাহাবাগণ যেখানে আছেন সেদিকে রওয়ানা হলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি বাড়ির দরজায় করাঘাত করলেন। রাসূলুল্লাহ (স) এর সাহাবাদের একজন উঠে গিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলেন উমর দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। তার হাতে খোলা তরবারি। তিনি ভীত হয়ে ফিরে এসে আল্লাহর রাসুল (স) কে তা বললেন। হযরত হামযা বললেনঃ সে যদি ভাল উদ্দেশ্যে এসে থাকে তা হলে আমরাও ভাল আচরণ করবো। আর যদি কোন খারাপ মতলবে এসে থাকে তাহলে তার তরবারি দিয়েই তাকে হত্যা করবো। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তাকে আসতে দাও। এরপর উমর রাসূলুল্লাহ (স) এর সামনে উপস্থিত হলে তিনি তার কোমরের পার্শ্বদেশ ধরে সজোরে আকর্ষণ করে বললেনঃ হে খাত্তাবের পুত্র, কি উদ্দেশ্যে তোমার আগমন বলতো।' উমর বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমি আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল (স) এবং তিনি যা এনেছেন তার প্রতি ঈমান ঘোষণার জন্য এসেছি।'

মুসলমানগণ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন

হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণে মুসলমানগণ আরো উৎসাহিত হলেন। হযরত উমর বায়তুল্লায় গিয়ে প্রকাশ্যে নামায আদায় করলেন এবং পরদিনই অতি প্রত্যূষে রাসূলুল্লাহ (স)এর প্রধান শত্রু আবু জেহেলের বাড়ি গিয়ে তাকে জানিয়ে আসলেন যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

এভাবে ইসলামের শক্তি ও প্রভাব ক্রমেই বেড়ে চললো। কাফেররাও সাধারণ মুসলমানদের ওপর তাদের আক্রমন ও নির্যাতন ক্রমশঃ তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুললো। নবী (স) এর আপন চাচা আবু লাহাবও কাফেরদের দলে ভিড়ে তাঁকে অনেক কষ্ট দিলো। আবু লাহাব ও রাসূলুল্লাহ (স) বাড়ি ছিল একই সাথে লাগোয়া। মাঝে ছিল শুধু একটি প্রাচীর। উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা) যখন বাড়ির আঙ্গিনায় প্রাচীরের পাশে খাবার পাকাতেন তখন প্রাচীরের ওপাশ থেকে খাবারের ওপর ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ করে তা নষ্ট করে দেয়া হতো। এ ছাড়া

মারওয়ানের পিতা হাকাম ইবনুল আস, উকবা ইবনে আবু মু'আইত, আদি ইবনে হামরা এবং ইবনুল আসদা আল হুযালীও আবু লাহাবের মত রাসূলুল্লাহ (স) এর নিকটতম প্রতিবেশী ছিল। তারাও নবী (স) এর সাথে একই আচরণ করতো। আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল (আবু সুফিয়ানের বোন) রাতের অন্ধকারে কাঁটাযুক্ত ডালপালা ও আবর্জনা এনে নবী (স) এর ঘরের দরজায় ও বের হওয়ার পথে ফেলে রাখতো যাতে সকালে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গিয়ে তিনি ও তার ছোট ছোট সন্তানেরা কষ্ট পান। এ ছাড়া আরো অনেকভাবে তারা নবী (স) কে কষ্ট দিতো।

হযরত খাদীজা (রা) ও আবু তালেবের ইনতিকাল

কুরাইশদের নানাবিধ বিরোধিতা, শত্রুতা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির পাশাপাশি নবী (স) ও মুসলমানদের চরম ধৈর্য, সাহস ও আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসার চলতে থাকে। এভাবে নবুওয়াতের ১০ম বছর এসে যায়। এটি ছিল নবী (স) এর জন্য সবচেয়ে দুঃখবহ বছর। এ বছরই নবী (স) এর প্রিয়তমা স্ত্রী ও পরামর্শদাতা হযরত খাদীজা (রা) এবং পৃষ্ঠপোষক ও পরম হিতৈষী চাচা আবু তালিব ইনতিকাল করেন। আবু তালিবের ইনতিকালে কুরাইশরা নবী (স) এর ওপর জুলুম নির্যাতনের এক মহাসুযোগ লাভ করে। এর সাথে চলতে থাকতে চরম বিরোধিতা। কুরাইশরা ইসলামী দাওয়াতকে ধ্বংস করতে এ সময় থেকে মারমুখী হয়ে ওঠে।

তায়েফ গমন

নবী (স) বুঝতে পারলেন যে, মক্কার লোকেরা তার আহবানে সাড়া দিতে প্রস্তুত নয়। তাই তিনি এবার তায়েফে গিয়ে সেখানকার লোকদের সামনে ইসলাম পেশ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। হযরত যায়েদ ইবনে হারেসাকে (রা) সাথে নিয়ে তিনি তায়েফে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বনী সাকীফ গোত্রের নেতাদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। কিন্তু তারা নবী (স) এর সাথে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করলো। তিনি সেখান থেকে ফিরে মুত'য়েম ইবনে আদীর নিরাপত্তায় মক্কায় প্রবেশ করলেন। এবং পুনরায় ঘরে ঘরে প্রত্যেক মানুষের কাছে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলেন।

হজ্জের মওসুমে প্রত্যেক গোত্রের লোকদের কাছে দাওয়াত

হজ্জের মওসুমে সমগ্র আরব উপদ্বীপের আনাচে কানাচে থেকে বিভিন্ন গোত্রের লোকজন হজ্জের জন্য মক্কায় আগমন করলে তিনি প্রত্যেক গোত্রের তাঁবুতে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে থাকলেন। একদিন তিনি ইয়াসরিব (মদীনার পূর্ব নাম) থেকে আগত কিছু লোকের তাঁবুতে গেলেন এবং তাদের নিকট থেকে অনুকূল সাড়া পেলেন। তারা হজ্জ শেষে ইয়াসরিবে ফিরে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স) এর নির্দেশনা মোতাবেক ইসলাম প্রচার করতে থাকলেন। পরের বছর হজ্জের মওসুমে তারা আরো কিছু লোককে সাথে করে আনলেন। আকাবা নামক স্থানে রাতের বেলা নবী (স) এর সাথে তারা একত্রিত হলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে নবী (স) এর হাতে বাইয়াত হলেন। তাদের সংখ্যা ছিল মোট বারজন। একেই আকাবার প্রথম বাইয়াত বলা হয়। নবী (স) মদীনায় তাদের গোত্রের মধ্যে কুরআন মজীদ ও ইসলাম শিক্ষা দেয়ার জন্য হযরত মুস'আব ইবনে উমায়ের (রা) কে পাঠালেন। তিনি মদীনায় আস'য়াদ ইবনে যুরারা'র বাড়িতে থেকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে কাজ করে চললেন। পরের বছর হজ্জের মওসূমে আকাবায় মদীনার তিয়াত্তর জন লোকের সাথে নবী (স)এর কথা হলো। তারা সবাই ইসলাম

গ্রহণ করলেন এবং তাকে মদীনায় যাওয়ার আহবান জানালেন। সিদ্ধান্ত হলো, সুবিধাজনক সময়ে অদূর ভবিষ্যতে নবী (স) মদীনায় চলে যাবেন।

মদীনার লোকেরা ছিল সৎ। তারা প্রায় সকলেই ইসলাম গ্রহণ করলে নবী (স) সেখানে একটি ছোট ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করলেন। এ রাষ্ট্রের প্রধান হলেন নবী (স) নিজে। এসব দেখে মক্কার কাফেররা সহ্য করতে পারলো না। তারা মদীনা আক্রমণ করলো। বদর, ওহুদ, খন্দক ও হুনায়েনে এরূপ অনেকগুলো যুদ্ধ হলো। একমাত্র ওহুদের যুদ্ধ ছাড়া সব যুদ্ধে মুসলমানরা জয় লাভ করলো। কাফেররা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়লো। বিভিন্ন যুদ্ধে তাদের অনেক বড় বড় নেতা মারা গেল।

হিজরী আট সনে নবী (স) দশ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মক্কা জয় করলেন। কাবা ঘরের মধ্যে যে তিন শত ষাটটি মূর্তি রাখা ছিল তা বের করে ফেললেন। এ সময় মক্কার সব লোক ইসলাম গ্রহণ করলো। তিনি তাদের সবাইকে মাফ করে দিলেন। এরপর সারা আরবের লোক দ্রুত ইসলাম গ্রহণ করলো এবং সমগ্র আরবে একটা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো।

হিজরী দশ সনে নবী (স) সারা আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় সোয়া লক্ষ সাহাবা সাথে করে হজ্জ করলেন। আরাফাতের মাঠে দাঁড়িয়ে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করলেন। মানুষের জীবনকে সঠিকভাবে চালানোর জন্য এ ভাষণ খুব গুরুত্বপূর্ণ। নবীর (স) এ হজ্জকে বলা হয় বিদায় হজ্জ। এ হজ্জের পর তিনি আর হজ্জ করার সুযোগ পাননি।

হজ্জ শেষে মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর নবী (স) অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং হিজরী ১১ সনের রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখে এ দুনিয়া ছেড়ে মহান আল্লাহর কাছে ফিরে গেলেন। ইনতিকালের সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর। পবিত্র মদীনা শরীফে মসজিদে নববীর মধ্যে তাঁর রওযা মোবারক অবস্থিত।

অনুশীলনী

১। সর্বশেষ রসুল কে? তিনি কত সনে কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন? তাঁর বংশ কেমন ছিল?

২। হযরত মুহাম্মদের (স) জন্মের সময় আরবের লোকেরা কেমন ছিল?

৩। তাঁকে লালন- পালনের জন্য মক্কার বাইরে কোথায় পাঠানো হয়েছিল।

৪। রসূলুল্লাহ (স) এর মা আমিনা মদীনায় গিয়েছিলেন কেন? মদীনা থেকে ফিরে আসার সময় কি ঘটেছিল?

৫। যৌবন লাভ করার পর নবী (স)-এর চরিত্র কেমন ছিল?

৬। মক্কার ধনী মহিলাটির নাম কি ছিল? তাঁকে সবাই 'তাহেরা' বলে ডাকতো কেন?

৭। নবী (স) কি দেখে বিচলিত হয়ে উঠতেন? তিনি হেরা পর্বতের গুহায় কিভাবে রাত কাটাতেন?

৮। তিনি কবে এবং কিভাবে আল্লাহর অহী পেলেন? অহী পাওয়ার পর তিনি কি করতেন?

৯। প্রথমে কে কে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন? ইসলামের মূল কথা কি?

১০। মক্কার বড় বড় নেতারা বিরোধিতা করলো কেন? তারা কিভাবে বিরোধিতা করলো?

১১। মদীনায় হিজরতের পর মক্কার কাফেররা কি করলো?

১২। নবী (স) কবে মক্কা জয় করলেন? তাঁর সাথে কত সৈন্য ছিল?